দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাংলা ভাষা বিকৃতির ফলে বাঙ্গালিদের চাকরি খাচ্ছে বাংলাদেশিরা

— পৃঃ ২৩

বাঙ্গালি জাতিসত্তা বেদখলে বাংলাদেশের তিনটি মিথ

— পৃঃ ২৬

৭৪ বর্ষ, ২ সংখ্যা।। ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ।। ২০ ভাদ্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৪ বর্ষ ২ সংখ্যা, ২০ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

৬ সেপ্টেম্বর - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাপপোস্ট
□ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

বিজাতীয় জাতীয় (তৃণমূল) সংগীত □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

কূটনৈতিক ক্ষেত্রের পুরনো মিত্রদের নিয়েই ভারতকে তালিবানদের মোকাবিলা করতে হবে □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ৮

কেন্দ্রীয় সরকারকে হেনস্থার ছক বিরোধীদের
□ বিশ্বামিত্র □ ১০

আমাদের ভাষার মাস হোক সেপ্টেম্বর □ প্রবীর ভট্টাচার্য □ ১১

এখনও বিচার পেল না দাড়িভিটের রাজেশ-তাপস-রা
□ নিখিল চিত্রকর □ ১৩

ভারতের কোনায় কোনায় লুকিয়ে থাকা তালিবানদের খুঁজে বের করুক সরকার □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৫

যোগী আদিত্যনাথ হয়ে উঠছেন মোদীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী
□ রঞ্জন কুমার দে □ ১৭

বাংলাভাষা বিকৃতির ফলে বাঙ্গালিদের চাকরি খাচ্ছে বাংলাদেশিরা □ দেবস্মিতা মুখার্জি □ ২৩

বাঙ্গালি জাতিসত্তা বেদখলে বাংলাদেশের তিনটি মিথ
□ সুমিত রায় □ ২৫

মহান শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন □ জবা পাল □ ৩১

জৈন সংস্কৃতির নতুন খোঁজ □ কৌশিক রায় □ ৩৩

শুধুমাত্র বিজেপিকে আটকাতে গিয়ে তলিয়ে গেছে অনেক দল
□ দুর্গাপদ ঘোষ □ ৩৫

জাতীয় নগদীকরণ পাইপলাইন একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ
□ সুদীপনারায়ণ ঘোষ □ ৩৭

মালীর উপস্থিত বুদ্ধিতে ব্রিটিশ পুলিশ হতবাক
□ পার্থসারথি বসু □ ৩৯

বামপন্থীদের মোপলা জামাইদের প্রতি আদিখ্যেতা
□ বিনয়ভূষণ দাশ □ ৪৩

ভারতের শরিয়তপ্রেমীরা এবার আফগানিস্তানে চলে যাক
□ ডাঃ নিত্যগোপাল চক্রবর্তী □ ৪৫

তালিবান আদর্শে বিরোধী মতাদর্শ গঠনে ব্যর্থতাই কি দায়ী আফগান-সংকটের জন্য □ ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী □ ৪৭

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দুর্গা আরাধনা □ কৌশিক দাস □ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্মরণে বুদ্ধদেব

তিনি যখন ছিলেন তখন বোঝা যেত যে তিনি আছেন। চলে যাবার সময়েও তিনি বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে, থাকবেন অনেকদিন। একজন লেখকের মৃত্যুতে এমন দীর্ঘশ্বাস শেষ কবে ফেলেছে বাঙ্গালি? তিনি বুদ্ধদেব গুহ। পৃথু ঘোষ থেকে ঋজুদা— সর্বত্র তাঁর অবাধ বিচরণ। করোনা থেকে সেরে ওঠার পরেও নানারকম অসুখে ভুগে সম্প্রতি চলে গেলেন। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যা বুদ্ধদেব গুহকে নিয়ে। লিখবেন— শেখর সেনগুপ্ত, হীরক কর, সিদ্ধার্থ সিংহ, অনামিকা দে প্রমুখ।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের ভাষাদিবস

পৃথিবীর প্রতিটি মানবগোষ্ঠীরই একটি মাতৃভাষা রহিয়াছে। সেই ভাষা তাহাদের চেতনার ভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন, মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সম। মাতৃদুগ্ধ ছাড়া যেমন শিশুর বিকাশ সম্ভব নয়, ঠিক তেমনই যেকোনো জাতির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মাতৃভাষা যেকোনো জাতির সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যেকোনো জাতিকে জানিতে হইলে, তাহার শিকড়কে জানিতে হইলে, সেই জাতির মাতৃভাষাকে জানা একান্ত প্রয়োজন। ভাষার শুদ্ধতা জাতিকে সমৃদ্ধ করে। বাংলাভাষা বাঙ্গালি জাতির প্রাণের ভাষা। বাঙ্গালির জাতিসত্তা রক্ষার ভাষা। কবি অতুলপ্রসাদ সেন বলিয়াছেন, ‘ মোদের গরব মোদের আশা আ-মরি বাংলাভাষা’। মধুকবি বলিয়াছেন, ‘ হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন’। সেই বাংলাভাষার উপর আক্রমণ নামিয়া আসিয়াছে বহু পূর্বেই। আরবীকরণের চক্রান্তে বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইহাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের ইহাতে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহারা অন্য দেশের ভাষা আন্দোলনের দিনটি লইয়া মাতিয়া ওঠেন। যে একুশে ফেব্রুয়ারি লইয়া পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা নাচানাচি করিতেছেন তাহার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের কোনোপ্রকার সম্পর্ক নাই। কেননা বাংলাদেশের আরবি-আধিক্য বাংলায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরা কথা বলেন না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ গঠিত হইবার পর বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রচার হইয়াছে বিশ্বময়। পশ্চিমবঙ্গের একটু শিক্ষিত বাঙ্গালিরা সালাম, বরকত, আবুল, জব্বারদের নাম জানেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বাংলাভাষার দাবিতে যিনি সর্বপ্রথম সরব হইয়াছিলেন, যাঁকে সপরিবারে পাকিস্তানি খানসেনারা নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে, সেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাম কেউ স্মরণ করেন না। ১৯৬১ সালে অসমের শিলচরে বাংলাভাষার জন্য ১১ জন প্রাণবলিদানকারীর নাম পশ্চিমবঙ্গের খুব কম মানুষই জানেন। পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রগুলি এই বিষয়ে একেবারেই নীরব।

ভাষাদিবস রূপে যদি পালন করিতেই হয় তাহা হইলে ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিদের স্মরণীয় ও পালনীয় দিন। এই দিন বাংলাভাষার উপর উর্দু আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বাঙ্গালি ছাত্রদের প্রাণ বলিদানের দিন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উত্তরদিনাজপুর জেলার দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলাভাষার শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। বাংলাভাষার শিক্ষক না থাকা সত্ত্বেও বাংলাভাষার শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া উর্দুভাষার শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। এইরূপ অন্যায়ের প্রতিবাদে মাতৃভাষাপ্রেমী ছাত্র-ছাত্রী, প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এবং গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে শামিল হন। উর্দু-আরবিপ্রেমী রাজ্য সরকারের পুলিশ সেই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে গুলি চালিয়ে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুই ছাত্রকে হত্যা করে। দশম শ্রেণীর এক ছাত্রও পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়। লাঠির আঘাতে বহু ছাত্র-ছাত্রী জখম হয়। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী মানুষ রাজ্য সরকারের এইরূপ বর্বরোচিত আচরণে গর্জে ওঠেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ইহার প্রতিবাদে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজ্য সরকার অদ্যাবধি কোনোরূপ সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। বাংলাভাষার উপর উর্দুর আগ্রাসনের প্রতিবাদে ছাত্রদের প্রাণবলিদানের দিনটি স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব ভাষা আন্দোলনের দিন। ২০ সেপ্টেম্বর বাংলাভাষাকে রক্ষার অঙ্গীকারের দিন। তাই নিশ্চিতভাবেই ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের ভাষাদিবস।

সুভাষিতম্

গুণঃ ভূষয়তে রূপং শীলং ভূষয়তে কুলম্।
সিদ্ধিঃ ভূষয়তে বিদ্যাং ভোগঃ ভূষয়তে ধনম্।।

সদ্‌গুণ রূপকে অলংকৃত করে, চরিত্র বংশকে ভূষিত করে, সিদ্ধি দ্বারা বিদ্যার শোভা বৃদ্ধি হয় এবং সদুপযোগের দ্বারা ধনের সঠিক মূল্যয়ন হয়।

‘একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্প-পোস্ট’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা বেশ গর্বের সঙ্গে বলেন, ‘আমাদের দলে একটাই পোস্ট, বাকিসব ল্যাম্প পোস্ট’। অর্থাৎ দল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বেসর্বা। বাকিরা খর্বাকৃতি। তাঁদের কাছে এটা একধরনের শ্লাঘা। এটা বলে তারা বোঝাতে চান তৃণমূল দলে সকলেই সমান শুধু মমতা অসমান। কারণ তিনি মাথা। বাকিরা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

শুনতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্য। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন তিনিই রাজ্যের ৪২ আসনে প্রার্থী। এর বিরুদ্ধে কেউ টুঁ শব্দ করেনি। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে মমতার দাবি ঠিক।

তবে আপাতত তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ মাথা কাটা পড়েছে। তা জোড়া লাগাতে ব্যস্ত পুরো দল। ২০২১-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে মমতা বিজেপির শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গিয়েছেন। তারপর থেকে রাজ্য জুড়ে হইচই শুরু হয়েছে। রাজ্যের ৭টি আসনে ৫ নভেম্বরের মধ্যে উপনির্বাচন করাতে তৃণমূল নেতারা দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছেন। বলা চলে নির্বাচন কমিশনে তারা এক প্রকার হত্যে দিয়ে পড়ে রয়েছেন।

গত তিন মাসের মধ্যে তাঁরা তিন-তিন বার নির্বাচন কমিশনের কড়া নেড়েছেন। যে করেই হোক ৫ নভেম্বরের মধ্যে ৭টি আসনে ভোট করাতে হবে। একটাই লক্ষ্য : ভবানীপুর। এটা সবাই জানেন। কারণ দল সুপ্রিমো ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই আসনে প্রার্থী। হেরে যাওয়ার পরেও তিনি ৫ মে মন্ত্রিত্বের শপথ নিয়েছেন। নিয়মানুসারে ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে কোনও একটি কেন্দ্র থেকে জিতে আসতে হবে। নইলে তাঁর মন্ত্রিত্ব খারিজ হয়ে যাবে। তাই তাঁর পুরোনো আসন ভবানীপুর এখন ‘সেফ সিট’। বাকি ৬টি আসনের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের খুব একটা মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। যদিও দলের দিল্লি ও রাজ্যের নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন ৭ আসনে ভোট হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।

যদি এমন হয় নির্বাচন কমিশন ভবানীপুর বাদ দিয়ে অন্য ৬ আসনে ভোট করালেন। তাতে নির্বাচন কমিশন পক্ষপাতদুষ্ট প্রমাণিত হবেন। মমতার হাত আরও শক্ত হবে। যদি উলটো হয়— অর্থাৎ ভবানীপুরে ভোট হলো আর নির্বাচন বাকি ৬ আসনে পরে ভোট। আমি হলফ করে বলতে পারি প্রথম চোটে তৃণমূল লোক দেখানো প্রতিবাদ করলেও কিছুদিনের মধ্যে সবাই সব ভুলে যাবে। কারণ কাটা মাথা আবার জোড়া লেগে যাবে। তাই বাকি অঙ্গ নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

করোনার দাপটে রাজ্যে ট্রেন চলছে না। স্কুল খুলছে না। তবে উপভোট করাতেই হবে। না হলে মাথা ছাড়া দেহ মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকবে। মমতার দাবি, রাজ্যে সংক্রমণের হার এখন সর্বনিম্ন অথচ তিনি ৩-৪ বার লকডাউনের মেয়াদ বাড়িয়েছেন। ২০২১ রাজ্য বিধানসভা ভোটের সময় তা ছিল সর্বোচ্চ। তখন ভোট হলে এখন কেন নয়? নির্বাচন কমিশনকে বোঝাতে ৫ জেলার উপনির্বাচন কেন্দ্রে— নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ আর কোচবিহারে তিনি আলাদা করে করোনার সংক্রমণ জরিপ করিয়েছেন। প্রমাণ দিয়েছেন সেখানে কোনও করোনার আক্রমণ নেই। তাই ভোট হতেই পারে।

উদ্দেশ্য একটাই কলকাতার ভবানীপুর কেন্দ্রে যেখানে তিনি প্রার্থী একসঙ্গে ভোট করিয়ে নেওয়া। সম্প্রতি রাজ্যের নির্বাচনে এই ৫ জেলার ১১২ আসনের মধ্যে তৃণমূল ৯২টি আসন জেতে। কলকাতার ১১টির মধ্যে ১১ আসন জেতে তৃণমূল। উপনির্বাচনের ৭ আসনের মধ্যে ২টি বিজেপি দখল করে, ২টি তৃণমূল জেতে, মুর্শিদাবাদের ২টি আসনে ভোট হয়নি।

বিজেপির দুই সাংসদ প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক আর জগন্নাথ সরকার দিনহাটা আর শান্তিপুরে রাজ্য নির্বাচন জিতলেও তারা সংসদে ফিরে যান। গোসাবা আর খড়দায় তৃণমূল প্রার্থীরা মারা যান। মমতা নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ায় শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে ভবানীপুর থেকে উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায় সরিয়ে দেওয়া হয়। মমতাকে জেতানোর জন্য শোভনদেব ওই আসন ছেড়ে দেন। বদলিতে মমতা শোভনদেবের জায়গায় প্রার্থী হন।

কিন্তু মেয়াদ ফুরানোর পর ১৮ মাস অতিরিক্ত কেটে গেলেও ১২৪টি কর্পোরেশন আর পুরসভার ভোট নিয়ে মমতা কোনও উচ্চবাচ্য করছেন না। উত্তরাখণ্ডের অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে তিনি সমানে প্রধানমন্ত্রী মোদী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহকে আক্রমণ করে চলেছেন। তাঁর ধারণা একদিনের জন্য হলেও ৫ নভেম্বরের মধ্যে ভোট না করিয়ে মমতাকে তাঁরা বেকায়দায় ফেলতে চান। ওই সময়ের মধ্যে নির্বাচিত হতে না পারলে মমতার মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ভোটের আগে তিনি অভিযোগ তুলেছিলেন যে মোদী-শাহর কথায় নির্বাচন কমিশন ছলচাতুরি করে তাঁকে হারানোর প্ল্যান করছে। কিন্তু তেমনটা হয়নি। উলটে রাজ্যের মানুষ তাঁরই দলকে জিতিয়েছেন। যদি শুভেন্দুর আঘাতে দলের মাথা কাটা না পড়ত তাহলে তৃণমূল নেতাদের এই আগ্রহ থাকত কী না তা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ বাকি ৬টি আসনে ভোট না হলেও তৃণমূলের কিছু এসে যায় না। মমতা চিরকাল সন্দেহপ্রবণ। আর সেটাই তার বুনিয়াদ। এই সন্দেহ তাঁকে বারবার সাফল্য এনে দিয়েছে। দলের ভিতরে- বাইরে মমতার সন্দেহ প্রবণতাই তাঁর দলকে এখনও অবধি বাঁচিয়ে রেখেছে। তবে কোনও কিছুরই অতিরিক্ত ভালো নয়। যত তাড়াতাড়ি মমতা তা বোঝেন ততই মঙ্গল।

(লেখক সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

বিজাতীয় জাতীয় (তৃনমূল) সংগীত

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, হাওড়া

দিদি, আপনাকে এই ঠিকানায় এই সম্বোধনে আর কতদিন চিঠি পাঠাতে পারব জানি না। করোনা পরিস্থিতির যা অবস্থা তাতে আপনি যেমন ট্রেন চালানোর ঝুঁকি নিচ্ছেন না তেমনই নির্বাচন কমিশনও উপনির্বাচন করার কথা ভাববে বলে মনে হচ্ছে না। জানি, আপনি খুবই কষ্টে আছেন। রাতের ঘুম ছুটে গিয়েছে। প্রতিদিন নিশ্চিত আপনি ঘুমের মধ্যেও সেই দিনটা দেখতে পান। মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে আপনি ইস্তফা দিচ্ছেন। পা ভেঙে, হুইলচেয়ার পলিটিক্স করে আপনি বাঙ্গলাকে বোকা বানাতে পারলেও নিজেও বোকা বনেছেন। দিদি, আপনার পা যদি ভবানীপুরে ভাঙত তাহলে সত্যিটা জানতে পারত না নন্দীগ্রাম। সেটা হলে আপনার নাটক সুপার ডুপার হিট হতো। নন্দীগ্রামের মানুষ সেটা জানে বলে ওদের ঠকানো সম্ভব ছিল না। হয়ওনি। আপনি হেরেছেন। আপনি হেরো মুখ্যমন্ত্রী।

দিদি, আপনি কিছু বলতেও পারবেন না আদালতে গিয়ে। কারণ, এটা সংবিধানের বিষয়। আরও বড়ো কারণ হচ্ছে যে, নানা ছুতোয় আপনি রাজ্যের ১২৮টি পুরসভায় ভোট করাননি। সুতরাং, কাচের ঘরে বসে আপনার পক্ষে ঢিল মারা সহজ হবে না। তাই দিদি আপনি বরং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের জন্য অপেক্ষা করুন। পশ্চিমবঙ্গের কোনও আসন থেকে সাংসদ হওয়ার চেষ্টা করুন। তবে আমার মনে হয়, মানে প্রস্তাব হলো, বারাণসী কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হন আপনি। আপনার একজন ভক্ত হিসেবে আমি চাই আপনি প্রধানমন্ত্রী হন। এবং সেটা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে হারিয়ে। এমন ইচ্ছা আপনি একবার প্রকাশও করেছিলেন। আর তৃণমূলকে সর্বভারতীয় করার জন্য আপনার ভাইপো মানে আমার অভিষেক ভাই যেমন উঠেপড়ে লেগেছেন তাতে এটাও একটা বড়ো পদক্ষেপ হবে। আপনারা খালি ত্রিপুরা ত্রিপুরা করছেন। কিন্তু মনে রাখবেন ত্রিপুরা আর বাংলা মানে ভারত নয়। মানচিত্র খুলে দেখুন, বুঝতে পারবেন।

কেন এই ভারতের মানচিত্রকে এই চিঠির মধ্যে নিয়ে এলাম তারও একটা কারণ আছে। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস নাম হলেও আসলে যে আপনার দল একেবারেই আঞ্চলিক সেটা মানতে শিখুন। প্রধানমন্ত্রী হবেন বলে যাঁদের নিয়ে আপনি বৈঠক করছেন তাঁরাও সকলে তাই। কংগ্রেস নামক শতাব্দী প্রাচীন দলটি জাতীয় বটে কিন্তু দেশের অনেকাংশেই তাদের উপস্থিতি খুঁজতে সিবিআই তদন্তের প্রয়োজন। এবার প্রশ্ন হলো, তৃণমূলকে জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে যেটা সবার আগে করা প্রয়োজন সেটা হলো জাতীয় সংগীতের প্রশিক্ষণ। এটা চালু করুন দিদি। প্রথমে মন্ত্রীদের। তার আগে নিজের। তার পরে নেতাদের। এর পরে সেটাকে বুথ স্তরে নামিয়ে নিয়ে যান।

অনেকদিন আগে আপনার মুখে বা মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের মুখে ভুল জাতীয় সংগীত শুনে আমি লজ্জিত হয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি যেটা দেখলাম তাতে গোটা দেশের কাছে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। এই নেট মাধ্যমের যুগে মুহূর্তে কোনও ভিডিয়ো ভাইরাল হয়ে পৌঁছে যায় দেশের প্রান্তে প্রান্তে। গ্রামে গঞ্জের ছেলেমেয়েরাও দেখেছেন, একটি রাজ্যের দীর্ঘদিন শিক্ষামন্ত্রী থাকা মানুষটি জাতীয় সংগীত গাইতে পারেন না বলে একজন দীর্ঘদিনের মুখ্যমন্ত্রী নিজে মুখে বলছেন। আর একজন শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় সংগীত যে বিজাতীয় সুরে, চোখ বুজে, ঘামতে-ঘামতে গাইলেন সে দৃশ্যও বিরল। আপনি নিজেও দিদি জাতীয় সংগীত চলার সময়ে যা যা করেছেন সেটা দেখলে বিস্ময় জাগে। হ্যাঁ, এই দেশে এমন অনেক নিরক্ষর মানুষ, অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত মানুষ হয়তো আছেন যাঁরা জাতীয় সংগীত ঠিক মতো গাইতে শেখেননি। সবার গলায় সুরও থাকে না। কিন্তু এ কী করলেন আপনারা! আপনারা তিনজনেই উচ্চশিক্ষিত। তিনজনেই নামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন।

গত ২৮ আগস্ট কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ছিল। সেই অনুষ্ঠানটি আপনি ছিনিয়ে নিয়েছেন। সোনিয়া, রাহুল গান্ধীরা সে সব না বুঝেও আপনাকে নিয়ে ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন দেখেন। সে যাই হোক। সেদিনের অনুষ্ঠানের শেষে আপনি সবাইকে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন করেন। বলেন, এবার জাতীয় সংগীত গাওয়া হবে। সেই সময় মঞ্চে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। ব্রাত্যবাবুকে জাতীয় সংগীত গাইবার দায়িত্ব দেন আপনি। এবার ব্রাত্য বসু কিছু বলেন ফিসফিস করে। সম্ভবত তিনি গাইতে পারবেন না বলে জানান। পার্থবাবুকে গাইতে বলেন। ভার্চুয়াল সেই সভা লাইভ চলছিল ফেসবুকে। লক্ষ লক্ষ দর্শক। শোনা যায়, আপনি পার্থবাবুকে দেখিয়ে বলছেন, "ও পারে না, তুমি করো না।" এবার ব্রাত্য বসু ঘাম মুখে জাতীয় সংগীত গাওয়া শুরু করেন। বারবার ছন্দপতন। তখনই আপনি ওর দিকে তাকান। ও আরও আরও ঘাবড়ে যান। সামলে নিয়ে কোনওক্রমে শেষ করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন।

দিদি, সব শেষে একটা কথা বলি। দিনরাত দেশবিরোধী কথা বলার পরে জাতীয় সংগীতের এই ধ্যাস্টামোটাও এবার বন্ধ করুন। □

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

কূটনৈতিক ক্ষেত্রের পুরনো মিত্রদের নিয়েই ভারতকে তালিবানদের মোকাবিলা করতে হবে

তালিবানদের হাতে নিতান্ত অপমানজনক পরাজয় ও সমর্পণের পর আফগানিস্তানের তরফে নিরন্তর বুক চাপড়ানোর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের নানা দেশে এর বিরুদ্ধে আপাত তীব্র আক্রোশ প্রদর্শিত হচ্ছে। আফগানিস্তানের সপ্তাহকালের মধ্যে নাটকীয় পতন ও তালিবানি ক্ষমতা দখল পর্বের মধ্যে আফগানিস্তানের তরফে রাষ্ট্রপতির চুপিসারে দেশ ছেড়ে পলায়নের মধ্যে পরাজয় মেনে নেওয়ার গ্লানিকে অস্বীকার করার কোনো ছলচাতুরি ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতির কেবলমাত্র জামাকাপড়ের ব্যাগ নিয়ে দেশ ছাড়ার মধ্যে যে বশ্যতা স্বীকারের প্রদর্শন ছিল তার ফলে আফগানরা যাকে বলে ফেকওয়াক পেয়ে যায়। সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার তো নয়ই আশরফ গনির দেশ ছাড়ার ফলে রাজনৈতিক সর্বোচ্চ ক্ষেত্র থেকে নির্দেশ দেওয়ার মতোই আর কেউ ছিল না। এর বেশ কিছু পরে তাঁর ভাই হাসমতি গনি প্রথমে সংবিধান মোতাবেক ক্ষমতার উত্তরাধিকারী ঘোষণা করলেও পরিস্থিতির আতঙ্কে তালিবানদের সমর্থন দেওয়া ছাড়া আর সাহস সঞ্চার করতে পারেননি।

এখন গনির দেশ ছাড়া ও তালিবানি শাসন প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমগ্র পাশ্চাত্যে যে প্রকাশ্য হতাশার ঢেউ এসেছে ও ঘিরে ধরেছে, সেটা ব্রিটিশ সংসদে ফরেন আফেয়ার্স সিলেক্ট কমিটির চেয়ারম্যান Tom Dughendhat-এর বক্তব্যে ধরা পড়েছে। আফগানিস্তানের শোচনীয় পরাজয় ও আত্মসমর্পণ নিয়ে হাউস অব কমনসে যে দীর্ঘ বিতর্ক চলছিল তাতে অংশ নিয়ে এই পূর্বতন সৈনিক তাঁর দেখা আফগানিস্তানের এক মর্মন্তুদ ঘটনার কথা জানিয়ে বলেন, তিনি একজন আফগানকে মরা শিশু কোলে নিয়ে সাহায্যের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরতে দেখেছেন— 'This is what defeat looks line– when you no longer have the choice of how to help...' পরাজিত মানুষের বা শক্তির অপরকে সাহায্য করার অধিকার বা অবস্থা কোনোটাই আর অবশিষ্ট থাকে না।

এই সূত্রে বলা যায় ভারতের কোনো সৈন্য আফগান ফ্রন্টে নিয়োজিত ছিল না, তাই এখানে কোনো সৈনিকের বিধবা পত্নীও নেই যার কাছে দেশকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু সেই ১৯৯৬ সাল থেকে যখন বাকি বিশ্ব আফগানিস্তানের মানুষের সামাজিক কাঠামো উন্নয়নের এবং অন্যান্য

সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিল। ভারত কিন্তু তখন থেকেই আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগ ছাড়াও বিপুল কৌশলগত এবং সেদেশের মানুষের আবেগের সঙ্গী হতে বিপুল অদৃশ্য মানসিক লগ্নি করেছে, কাবুলের দূতাবাসের কর্মীদের নিয়ে সেখানে তালা পড়ে গেলেও বিভিন্ন চরিত্রের লগ্নিগুলি কিন্তু সেখানে রয়েছে।

আমাদের বিশাল বিনিয়োগগুলি এককথায় সুকৌশলী ও সুবিবেচনাপ্রসূত। এরই ফলশ্রুতিতে আফগানিস্তানের মানুষ সর্বদাই আন্তরিক আবেগ দিয়ে ভারতকে ও তার মানুষকে ভালোবেসেছে। উদাহরণস্বরূপ সেদেশের প্রায় নাবালক ক্রিকেট টিমকে প্রশিক্ষণের ভার ভারতের হাতে তুলে দেওয়া থেকে সেখানকার সংসদ ভবন নির্মাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির দায়িত্ব ভারতের ওপরই দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় সুরকারদের দেওয়া জনপ্রিয় গানের সুর সেখানকার এক টুকরো আশা ও সুখের অভিলাষী দেশবাসীর কণ্ঠে গুঞ্জরিত হতো। মানতেই হবে ভারত খাইবার পাস অঞ্চলে একটি মানবিক মুখ-সহ সফ্‌ট পাওয়ার অবশ্যই ছিল। আজ সব চেয়ে বড়ো বিপদ ও আশঙ্কা এই যে হয়তো সেই দীর্ঘ লালিত সংস্কৃতিকে বিলুপ্ত করে দেওয়া হবে। তাই মানতেই হবে একদিক দিয়ে আমাদেরও আফগানিস্থানে বহুমুখী পরাজয় অবশ্যই হয়েছে।

তালিবানি ক্ষমতা দখলের প্রতিক্রিয়া ভারতের ওপর নানা প্রকারের নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তালিবানদের আগমনে বাস্তবে পাকিস্তানের ডুরান্ডলাইনের

সীমারেখা অনেকটা এগিয়ে সরাসরি ইরানের সীমান্ত থেকে এবার শুরু হবে। তালিবানরা তো তাদের বন্ধু দেশ। বস্তুত, ২০০২ ফলে আফগানিস্তানে ঘটা পরিস্থিতির সঙ্গে ইসলামাবাদ কখনই খাপ খাওয়াতে পারেনি, তারা অসুখী ছিল। তারা নিরন্তর চেষ্টা চালাতো কীভাবে আফগানিস্তানে তারা কৌশলগতভাবে এক ধরনের দমন বজায় রাখবে। বলতেই হবে আফগানিস্তানে তাদের দীর্ঘকালীন প্রয়াস এবার ফলদায়ী হয়েছে। কেননা লাদেনকে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে দীর্ঘ দিন আত্মগোপন করিয়ে রাখানো কি বড়ো বিনিয়োগ নয়? সে তো ছিল তালিবানি গুরু। Twin Tower ধ্বংসের দীর্ঘদিন পর ২০১১ সালে সে মার্কিনি আক্রমণে নিহত হয়। অবশ্য তালিবানদের বহু মধ্যযুগীয় প্রথার সঙ্গে আপোশ করে পাকিস্তানকে স্বদেশে কিছুটা অস্বস্তির মোকাবিলা করতে হবে। প্রকাশ্যে জিহাদিদের উৎসাহ দেওয়ারও একটা মূল্য তাদের চোকাতে হবে। সেটা সময়ই বলবে। তবে এই হতাশা কাটাতে তালিবানি জয় ভারতের সঙ্গে 'হাজার ক্ষতের' যুদ্ধ আরও জোরদার করতে তাদের মানসিকভাবে চাঙ্গা করবে।

তালিবানরা আফগান বিজয়ের পর প্রেস বিবৃতি দিয়ে গালভরা বাণী দেয় যে, আফগানিস্তানের মাটি সন্ত্রাসের জন্য কখনও ব্যবহার করতে তারা দেবে না— কথাটা কিছু 'ধান্দাবাজ মূর্খরা' বেশ বিশ্বাস করেছে এমনটা ভাব দেখায়। নতুন প্রশাসন কখনও বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ ছড়ানোর সূতিকাগার হিসেবে কখনই নতুন আফগানিস্তানকে কলঙ্কিত করবে না। কথাটা অবশ্য বিশেষ ভাবে তাদের প্রাথমিক স্বীকৃতি দেওয়া রাশিয়া ও চীনের সমর্থক অন্য পশ্চিম দেশগুলির উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বলা। প্যালেস্টাইন তথাকথিত স্বাধীনতার জন্য প্রায়শই যেভাবে ইজরাইল দখল করতে যায়। তার মূলে রয়েছে মৌলবাদী ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার ভাবনা। ঠিক যেটির কার্বন কপি কাশ্মীরেও লাগু করার জন্য ৯০-এর দশক থেকে পাকিস্তানি মদতে ছায়াযুদ্ধ চলেছে। আজ পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তন হলেও একটি সম্পূর্ণ জিহাদি শাসন প্রতিষ্ঠা পাকিস্তানের মতলবে মদত দেবে ধরা যায়। জিহাদি তালিবানরা সব ভালো হয়ে যাবে ভারতের পক্ষে একথা মেনে নেওয়া দুষ্কর। তালিবানদের ওপর পাকিস্তানে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, তাদের নেতৃত্বের ওপর আইএসআই-এর দাপট তাদের কঠিন সময়েও ছিল। সেটা তারা ভুলবে না। খুব জোর ভারতের সঙ্গে একটা শুকনো সৌহার্দ্যের সম্পর্ক রেখে যেতে পারে হয়তো।

মনে রাখতে হবে, তালিবানদের প্রতি আকর্ষণ কেবলমাত্র আফগানিস্তানের চৌহদ্দির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আফগান নয় এমন বহু সংখ্যা ও পন্থায় বিভক্ত মুসলমান রয়েছে যাদের কাছে আফগান জিহাদিরা বিশ্বব্যাপী জিহাদকে ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রেরণার কাজ করবে। আমেরিকা এবং এনএটিও-র অন্তর্গত শক্তির বিরুদ্ধে আফগানদের জয় এই বিশ্বাসকেই আরও গভীর করে তুলবে যে দৃঢ়তা ও সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পারলে পৃথিবীর আধুনিকতম অস্ত্রের ও শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করে জয় পাওয়া যায়। গোঁড়া মৌলবাদী মুসলমান যারা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে আছে তারা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। এই মৌলবাদীদের কাছে দেশের সীমানা, সীমান্ত কিছু নয়, কট্টর জিহাদের মাধ্যমে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। এই বিজয় উন্মাদনা ভারতের অভ্যন্তরে কীভাবে কাজ করছে বিশেষ করে কাশ্মীর উপত্যকায় এর কতটা প্রভাব পড়ছে তাতে সর্বদা নজর রাখা এবং প্রয়োজনে তার প্রতিরোধ একান্ত জরুরি।

ভারতের পক্ষে চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত বিশালাকার। প্রথমত, পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে চীন আফগানিস্তানে তার দাপট বিস্তার করতে তৎপর হয়ে উঠবে। তালিবানের মতো আরও একটি জিহাদি শক্তির মদত নিয়ে তাদের বড়োসড়ো বেল্ট রোড তৈরিকে ত্বরান্বিত করবে। দ্বিতীয়ত, ভারতের পক্ষে তালিবানদের ওপর চাপ সৃষ্টি ইরান ও রাশিয়ার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক তৈরির ক্ষমতার ওপর অনেকটাই নির্ভর করবে। দেশের ঘোষিত বিদেশনীতির পক্ষে বিষয়টা খুব সহজসাধ্য নয়। এই ধরনের নির্দিষ্ট দেশগুলি ভারতের কাছ থেকে কোনো বিশেষ সুবিধে পাওয়ার বিনিময়েই তাদের হাত বাড়াবে। নতুন ক্ষমতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে ভারত একটু দুর্বল পিচে খেলতে নামল যেখানে ঘূর্ণিপাক রয়েছে। তবে সবই নির্ভর করবে ঘটনা পরম্পরার রূপ ভবিষ্যতে কী দাঁড়াবে।

বাড়তি দুঃসংবাদ হিসেবে ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু এনএটিও জোটের শক্তি আফগানিস্তানে টুকরো টুকরো অংশে বিভক্ত হয়ে গেছে। আফগানিস্তানে জাতি নির্মাণ প্রকল্পের ভ্রান্ত আমেরিকান পরিকল্পনাই এর জন্য দায়ী। আজ তালিবানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সেখানে দুটিই শক্তি আছে— (১) শহুরে আফগান জনতা বিশেষ করে মেয়েরা। এরা মধ্যযুগীয় তালিবান শাসনে মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও মনুষ্যেতর ব্যবহার মেনে নিতে পারছে না। তারা নিজস্ব স্বাধীনতার পরিসরটুকু না হারাতে মরিয়া। এ বিষয়ে তারা পাশ্চাত্য দেশগুলির কাছে দাবি করবে, প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে ব্যাপক প্রচার করা হোক। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের এমন মরণপণ প্রতিবাদেও তালিবানি হৃদয়ে কোনো রেখাপাত হবে না, কেননা আধুনিকতাকে তারা অবক্ষয়ের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করে।

এরই মধ্যে পঞ্জশির উপত্যাকার নিহত আফগান বীর পূর্বতন উপরাষ্ট্রপতি প্রবাদপ্রতিম আহমেদ মাসুদের ভাই আমিকল্লা সালেহকে ঘিরে প্রতিরোধ গড়ে উঠছে। এই প্রতিরোধ মেয়েদের থেকে অবশ্যই শক্তিশালী— এরা সারা বিশ্বের কাছে সমর্থন প্রত্যাশী। ১৯৯০ সালে আফগানিস্তানে তালিবান উত্থানের যারা বিরোধিতা করেছিল ভারত তাদের কাছেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই পুরনো বন্ধুদের ফেলে দেওয়া ঠিক হবে না। প্রাথমিকভাবে পথে কাঁটা থাকলেও ঝুঁকি নিতেই হবে যদি বড়ো বিপদ কিছুটা প্রশমিত করে যায়।

(লেখক প্রাক্তন রাজ্যসভার সদস্য)

কেন্দ্রীয় সরকারকে হেনস্তার ছক বিরোধীদের

আফগানিস্তানের একটি স্কুলে শিক্ষকের কর্মে রত বেলঘরিয়ার নিমতার এক যুবক দেশে প্রত্যাবর্তন করে তালিবান শাসনের প্রভূত সুখ্যাতি করেছেন। এমনকী টেলিভিশনে প্রত্যহ বিশ্ববাসী যেভাবে তালিবানি নৃশংসতার সাক্ষী হচ্ছেন, তাকেও অস্বীকার করেছেন ওই যুবক। তাঁর বক্তব্য, যেহেতু তিনি এতদিন আফগানিস্তানে ছিলেন, তাই বাস্তব অবস্থাটা (গ্রাউন্ড রিয়ালিটি) তিনি ভালোই জানেন। তাঁর এই গ্রাউন্ড রিয়্যালিটি অনুযায়ী মোদ্দা কথা যা দাঁড়াচ্ছে, আফগানিস্তানে মোটেও তালিবানি হত্যালীলা চলছে না। যে কজন মানুষ সেখানে মারা গেছেন, তা নাকি মার্কিন সেনার গুলি চালনায়। তালিবান সেনা গুলি চালিয়েছে এটা সত্য, তবে তা নাকি নেহাতই শূন্যে। এবং তাও পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে, স্রেফ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাঁর এই বক্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, তাতে হাসির ঝড়ও যেমন উঠেছে, তেমনি নিন্দাও হয়েছে ওই যুবকের এহেন প্রলাপে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় আরেকটি ছবি ভাইরাল হয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে আফগানিস্তানে তালিবান-হামলায় আটকে পড়া ওই যুবকের কাতর অনুনয়োক্তি, 'মোদীজী আমাদের বাঁচান'। সোশ্যাল মিডিয়ায় যুবকের এই ভোলবদল নিয়ে বহু মানুষ প্রশ্ন করেছেন।

যুবকটি যখন টিভি ক্যামেরার সামনে বাইট দিচ্ছিল, তার পেছনের দেওয়ালে টাঙ্গানো চে গেভ্যারার একটা ছবি দেখা গেছিল। এখানে স্পষ্টতই মনে হয়, কোন রাজনৈতিক দীক্ষায় সে দীক্ষিত এই ছবিটিই তা বলে দিচ্ছে। সেটুকু স্পষ্ট হলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, তার এধরনের ভয়ংকর মিথ্যা বলার কারণ এবং তার ভোলই বা কী কারণে বদলাল। এর শেকড়ে গেলে বোঝা যাবে, যবে থেকে বাঙ্গালির তরুণ প্রজন্ম রাসবিহারী বসুকে স্থানচ্যুত করে তাঁর জায়গায় চে গেভ্যারা ইত্যাদিকে জায়গা দিয়েছে, সেদিন থেকে শুধু রক্ত-মাংসের বিপ্লবকে অস্বীকার করে সুখের বিপ্লবের রোম্যান্টিকতাতে মশগুলই হয়নি, সেইসঙ্গে স্বদেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর পূজার অভীপ্সায় জাতীয় নিরাপত্তায় বড়োসড়ো ক্ষতেরও সৃষ্টি করেছে। নিমতার সেই যুবক একটা উদাহরণ মাত্র। যেহেতু এই ঘটনার কথা সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছে। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু খেয়াল করলে দেখবেন, নানান থ্রেড ইতিমধ্যেই আসতে শুরু করে দিয়েছে, যেমন 'তালিবান ভয়ংকর, কিন্তু আরএসএসও একইভাবে ভয়ংকর', 'মুসলমান মৌলবাদের নিন্দা করতে হলে হিন্দু মৌলবাদেরও নিন্দা করুন', 'তালিবানি হানায় কিন্তু প্রাণ যাচ্ছে মুসলমান আফগানদেরই' আর সর্বোপরি তো আছেই, 'সন্ত্রাসবাদের কোনো ধর্ম হয় না' বুলি। আগের সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনেই লেখা হয়েছিল যে, এদেশের একশ্রেণীর মুসলমান ও বাংলাদেশি নাগরিকদের কাবুলের তালিবান-দখল নিয়ে কণ্ঠে রীতিমতো উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে, যাতে জাতীয় নিরাপত্তার কপালে ভাঁজটাই চওড়া হয়েছে।

আমাদের আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণিত করে এখন আফগানিস্তান- তালিবান সংক্রান্ত উপরোক্ত যে প্রচারগুলো চলছে, তা শুধু বিশ্ব-সন্ত্রাসবাদকেই লঘু করে দেখাচ্ছে না উপরন্তু বিশ্বের প্রধান মাথাব্যথার কারণ মুসলমান সন্ত্রাসবাদ এবং সেই সূত্রে শরিয়তি বিশ্বাস ও আইনের ভয়াবহতাকেও অস্বীকার করার ব্যাপারে মদত দিচ্ছে। ভারত সরকার তার সব নাগরিককে ঐক্যসূত্রে বাঁধতে ও জাতীয় সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মাধ্যমে কোভিড-পূর্ব পরিস্থিতিতে সংবিধান-সংশোধনের যে উদ্যোগ নিয়েছিল; বিরোধীদের শত চক্রান্তেও যা আটকানো সম্ভবপর হয়নি, তাকেই এখন আফগানিস্তানের মাপকাঠিতে উপস্থাপিত করে আরেকটু উসকে দেওয়ার জন্য একটা আয়োজন যে চলছে তা বোঝার জন্য কোনো জ্যোতিষী হওয়ার দরকার পড়ে না। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, একটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের মুখপত্রের শিরোনাম হলো— 'আফগানিস্তান নিয়ে প্যাঁচে পড়েছে ভারত-সরকার'। যেন দেশের সরকারকে যেনতেনপ্রকারেণ প্যাঁচে ফেলাটাই এদের মোক্ষ। আগামীদিনে নাকি এই দলেরই ওপর দেশের শাসক-জোট বিরোধী মহাজোটের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে। এবং জেনে রাখুন এই দলের নীচুস্তরের চালিকাশক্তি মূলত মাওবাদীরাই। ফলে দেশের রাজনীতি আগামীদিনে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির দিকে বাঁক নিতে চলেছে, তা সহজেই অনুমেয়।

আফগানিস্তানে তালিবান সাম্রাজ্যের আগমনে বামপন্থীরা নিশ্চয়ই খুশি, তাঁরা হৃতশক্তি হলেও তাঁদের বন্ধুরা কিন্তু ভারত সরকারকে গাড্ডায় ফেলার এতবড়ো সুযোগ হারাতে চাইবেন না।

কারণ ভারতের এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ কিন্তু চীন- পাকিস্তান নিতে চাইবে। নিমতার সেই যুবক আবার টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, আফগান-তালিবান দ্বন্দ্ব নিয়ে কোনও মন্তব্য অশোভনীয়, কারণ সেটা নাকি তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার! এই যদি মানসিকতা হয় এবং নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে এই সুযোগ নিয়ে যদি চীন-পাকিস্তানের দালালি করার নৈতিক অধিকার পাওয়া যায় তবে দেশের সার্বভৌমত্বে ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় আগামীতে বড়োসড়ো আঘাত আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং সময় থাকতে থাকতেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অনেকেরই হয়তো মনে আছে, বছর কুড়ি আগে আফগানিস্তানে তালিবান-জমানার অবসানে এদেশে ঠিক একইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, বামপন্থীরা মিছিল করেছিল 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'-এর দাবিতে। এখন আফগানিস্তানে তালিবান সাম্রাজ্যের আগমনে তাঁরা নিশ্চয়ই খুশি, তাঁরা হৃতশক্তি হলেও তাঁদের বন্ধুরা কিন্তু ভারত সরকারকে গাড্ডায় ফেলার এতবড়ো সুযোগ হারাতে চাইবেন না। তাই দেশের সরকারকে এবিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে, দেশবাসীকেও সতর্ক থাকতে হবে।

আমাদের ভাষার মাস হোক সেপ্টেম্বর

প্রবীর ভট্টাচার্য

‘গলঞ্চা ওই নদীর তীরে, মাটির নীচে একটু সরে, কালচে রক্ত বুকে নিয়ে, রাজেশ তাপস আজও শুয়ে...’। এই সেপ্টেম্বরেই, খর ক্ষিপ্র বৈশাখে নয়, সোনা ঝরা ফাল্গুনে নয়, এই পচা ভাদ্রে দাড়িভিটের মাটিতে আগুন জ্বালিয়ে বাঙ্গলা মায়ের দুই দামাল ছেলে রাজেশ ও তাপস বাংলাভাষা শিক্ষার দাবিতে বীরগতি প্রাপ্ত হলো। ভাষার জন্য জীবন দেওয়ার ইতিহাস বাঙ্গালি ছাড়া বিশ্বে সম্ভবত আর নেই। ভারতবর্ষে অঞ্চলভিত্তিক বেশ কিছু প্রাচীন ভাষা আজও নিজের অস্তিত্বে বিদ্যমান। তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতির সমাদর কিছু কম নয়।

কিন্তু বাঙ্গালির মতো ভাষার জন্য প্রাণবলিদান কোথাও দেখা যায় না। যে মানুষ বাঙ্গালিকে ভেতো বলে গাল দেয়, বাঙ্গালির এই ভাষাপ্রেমের ইতিহাস তাদের জানা উচিত। বাঙ্গলি বীরের জাত, ইতিহাস তার সাক্ষী। তাই মানভূম ও শিলচর— কোথাও বাঙ্গালি মাথা নত করেনি। এই তো সেদিন, দাড়িভিটে ভাষার জন্য আরও দুই তরুণের বলিদান— বাংলা ভাষার জন্য ধারাবাহিক লড়াইয়ের আরও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

দাড়িভিটের বিচার আজও অধরা। সিআইডি না সিবিআই— কার তদন্তে এই হত্যাকাণ্ডের সুবিচার আসবে, তা আগামীদিনের ইতিহাস বলবে, কিন্তু তার জন্য দাড়িভিটের আন্দোলন বৃথা হয়ে যেতে পারে না। উর্দু নয়, বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করতে চাওয়া একদল কোমলপ্রাণ শিক্ষার্থীর মরণপণ লড়াই, এই সময়েও আরও একবার প্রমাণ করিয়ে দেয় বাংলাভাষা আমাদের মা, তাঁকে বাঁচাতে বাঙ্গালি পিছপা হয় না।

মানভূমের ও বরাকের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। হিন্দু বাঙ্গালির বিপ্লবী চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে কার্জনের কূটচাল বঙ্গভঙ্গ। স্বাধীনতার পর বঙ্গভাষী এক বিরাট অংশ যারা বিহারের মানভূমে বসবাস করতেন, তারাও মূলত বাংলাভাষায় পড়াশোনার দাবি নিয়ে গণ-আন্দোলন শুরু করেছিল। অতুলচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে লোক সেবক সঙ্ঘ স্বাধীনতার পরপরেই আন্দোলন শুরু করে। অতুলচন্দ্রের স্ত্রী লাবণ্যপ্রভা দেবীর মরণপণ লড়াই তাঁকে ‘মানভূমের মা’ নামে ভূষিত করে। পৃথিবীর দীর্ঘতম এই ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী নেত্রী লাবণ্যপ্রভা ঘোষের অন্যতম সহযোগী ছিলেন আরও এক বীরাঙ্গনা ভাবিনী মাহাতো। বিহার সরকার বাংলাভাষীদের এই প্রতিবাদসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করলে সেদিনও রক্ত ঝরেছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলন টুসু সত্যাগ্রহ আন্দোলনের টুসু গানের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার বাংলাভাষী মানুষ কারাবরণ করেন। ঘরে ঘরে সেদিন শোনা যেত—

‘শুন বিহারি ভাই/তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই/তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি/বাংলা ভাষায় দিলি ছাই’।

সেপ্টেম্বর হয়ে উঠুক বাংলাভাষার মাস। রাজেশ-তাপস এই সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে নিজের জীবন দিয়ে আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে বীরভূমির বাঙ্গালি মাথা নত করতে জানে না।

মানভূমের মানুষের এই দাবির কাছে মাথা নত করেছিল ভারত সরকার। ১৯৫৬ সালে বাঙ্গলা-বিহার-সীমান্তের বিল লোকসভা রাজ্যসভায় পাশ হয়। ওই বছরেই ১ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে ২ হাজার ৪০৭ বর্গমাইল এলাকার ১১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৭ জন মানুষকে নিয়ে তৈরি হওয়া পুরুলিয়া জেলা হলো বাংলা ভাষার দাবিতে লড়াই করার ফল।

অসমের বরাক উপত্যকার বাংলাভাষা আন্দোলন ছিল অসম সরকারের অসমীয় ভাষাকে রাজ্যের একমাত্র দপ্তরিক ভাষা করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, যেহেতু ওই অঞ্চলের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল বাংলাভাষী। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে নামে বরাক উপত্যকার অসংখ্য বাঙ্গালি। আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি সহিংসতায় ব্রহ্মপুত্র এলাকা থেকে ৫০ হাজার হিন্দু বাঙ্গালি পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসে। সেই সময় কামরূপের গোরেশ্বর অঞ্চলে ২৫টি গ্রামের ৪,০১৯টি কুঁড়েঘর ও ৫৮টি বাড়ি আক্রমণ ধ্বংসও করা হয়, এই জেলা ছিল সহিংসভার সবচেয়ে আক্রান্ত এলাকা। ন’জন বাঙ্গালিকে হত্যা করা হয় এবং শতাধিক লোক আহত হয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চালিহার আনা অসমীয় ভাষাই একমাত্র দপ্তরি ভাষার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কাছাড় গণ সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ১৯৬১ সালে এপ্রিল মাসে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দির মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ ছিল অন্তত ২০০ কিলোমিটার পদযাত্রা। সংকল্প গ্রহণ হয় সরকার যদি সিদ্ধান্ত বদল না করে, তবে শুরু হবে গণ হরতাল। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জে গণ হরতাল শুরু হয়। সেই দিনই তারাপুর (বর্তমান শিলচর) স্টেশনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিংকারীদের ওপর

অসম রাইফেলসের গুলিতে ১২ জন গুলিবিদ্ধ হন। ঘটনায় এক কিশোরী কন্যা কমলা ভট্টাচার্য-সহ ১১ জনের মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ আহত দ্বাদশতম ব্যক্তি দীর্ঘ ২৪ বছর শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে লড়াই করে ১৯৮৫ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটি ভাষা আকাশ থেকে টুপ করে ঝরে পড়ে না। বরং বহুদিনের লালিত সংস্কৃতি ভাষাকে ঋদ্ধ করে, লালন পোষণ করে, পালন করে। দাড়িভিটের ভাষা আন্দোলন অতীতের সেই লড়াইগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃহৎবাংলাদেশ গঠনের জন্য অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো এতদিন জিহাদিদের যে চোরাস্রোত বইছিল, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর বিধানসভার দাড়িভিট উচ্চবিদ্যালয়ের একশোভাগ বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের পাঠক্রমকে বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষায় করে দেওয়ার ঘৃণ্য চক্রান্ত ধরে ফেলল সমাজের কোমলমতি কিশোর-কিশোরীরাই। তীব্র প্রতিবাদ জানাল তারা। শিক্ষক, প্রশাসন যখন কোনোমতেই তাদের কথা গ্রাহ্য করছে না, সেই সময়ে বাঙ্গলামায়ের দামাল এই ছেলে- মেয়েরা শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। সেদিনটি ছিল সেপ্টেম্বর মাসের বিশ তারিখ, ২০১৮ সাল।

প্রায় দেড় হাজার শিক্ষার্থীর দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ের স্থায়ী শিক্ষক সংখ্যা লজ্জাজনক। শিশু শিক্ষার অধিকারে ছাত্র-শিক্ষক গড় হার যেখানে ৩০/৪০ ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক থাকার কথা, দাড়িভিট বিদ্যালয়ে তা ছিল প্রায় ১০০ জন ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান--- সব বিষয়ে শিক্ষকের অভাব সেখানে থাকলেও প্রশাসন প্রায় জোর করে বিদ্যালয়ে স্থায়ী উর্দু শিক্ষক নিয়োগের অনুমতি দিয়ে উর্দু মাধ্যম শুরুর সূচনা করার প্রয়াস নেয়। শুধুমাত্র শিক্ষার্থী নয়, স্থানীয় মানুষের বারংবার আবেদন নিবেদনও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো মতেই শুনতে রাজি হয়নি। বৃহৎ বাংলাদেশ গঠনে এই গোপন অভিসন্ধি বাস্তবায়িত করতে মরিয়া হয়ে ওঠা জিহাদিরা সেদিন শিক্ষার্থীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য অন্যায়ভাবে প্রশাসনকে ব্যবহার করতে পিছপা হয়নি। বিগত কয়েক বছরে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় হিংসায় দীর্ণ পশ্চিমবঙ্গে ঠিক সময়ে পুলিশ এসেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলিও চালিয়েছে এমন উদাহরণ দেখা যায়নি। এই তো সেদিন নাগরিক অধিকার পাওয়ার মতো একটি আপাত অত্যন্ত নিরীহ আইনের প্রতিবাদে হাজার হাজার উন্মত্ত জিহাদি যে ভাবে গোটা রাজ্যে আতংক ও ধ্বংসের পরিবেশ তৈরি করেছিল তাতে রাজ্যপুলিশের নিষ্ক্রিয়তা (৪৬-এর গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস স্মরণ করায়) এই বৃহৎ ষড়যন্ত্রের সত্যতাকেই প্রতিষ্ঠা দেয়। বিশে সেপ্টেম্বর গুলিবিদ্ধ গুরুতর আহত রাজেশ সরকার, তাপস বর্মণ, বিপ্লব সরকার ও বাচ্চু শিকদারকে নিয়ে যখন গ্রামবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে ভ্যানে চাপিয়ে ইসলামপুর হাসপাতালের দিকে রওনা দিয়েছিল, আঘাত এসেছিল সেই পথেও। শ'য়ে শ'য়ে সশস্ত্র শান্তির দূতেদের পথ আগলে প্রতিরোধ তৈরি করার ঘটনায় পাঠক অনুমান করে নিন এসব কীসের ইঙ্গিত বহন করছে?

বাঙ্গালির নিজের ভাষা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লড়াই শুরু হয়েছিল তো সেই ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে রাজা লক্ষণ সেনের সময়ে। তুর্কি দস্যু বখতিয়ার খিলজির শাসনের নামে লুঠপাট আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে। একে একে মোগল, পাঠানদের প্রতিহত করে বাঙ্গালি রাজা প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, চাঁদ রায়, আকানন্দ, বাকানন্দ থেকে বালিয়া বাসন্তীর বাগদী রাজা চন্দ্রনাথ ধাড়া, ভুরসুটের রানি ভবশঙ্করীর অমিত বিক্রম বাঙ্গালির গৌরবের ইতিহাস। রাজেশ- তাপসের বলিদান এই গৌরবকেই আরও মহিমান্বিত করেছে।

আধুনিক বাংলা গদ্য ভাষার জনক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী, বিমল করের মতো বাংলাভাষার স্তম্ভ লেখকদের আবির্ভাব এই সেপ্টেম্বরেই। তাই সেপ্টেম্বর হয়ে উঠুক বাংলাভাষার মাস। রাজেশ-তাপস এই সেপ্টেম্বরের বিশ তারিখে নিজের জীবন দিয়ে আরও একবার প্রমাণ করে দিয়েছে বীরভূমির বাঙ্গালি মাথা নত করতে জানে না।

(লেখক আকাশবাণী কলকাতার সংবাদপাঠক, শিশু অধিকার কর্মী ও সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সম্পাদক)

With Best
Compliments from-

A
Well
Wisher

এখনও বিচার পেল না দাড়িভিটের রাজেশ-তাপসরা

নিখিল চিত্রকর

দাড়িভিটের অদূরে, গলঞ্চা নদীর তীরে মাটির নীচে অনন্ত শয়ানে দুটি দেহ। আজও দিন গুনছে বিচারের আশায়। ভাষা শহিদ রাজেশ- তাপসের দেহ আগলে বাংলা ভাষার অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জিইয়ে রেখেছে দাড়িভিট। সাম্প্রতিক বাংলা ভাষা আন্দোলনের পীঠভূমি।

উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ব্লক। তার অদূরেই দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে, ২০১৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর আন্দোলন চলাকালীন রাজ্য সরকারের বন্দুকের বুলেটে খুন হয় রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশ সেদিন রাজেশ তাপসদের আন্দোলন প্রতিহত করার লক্ষ্যে স্কুল প্রাঙ্গণে ঢুকে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রী, প্রাক্তনী ও অভিভাবকদের উপর চড়াও হয়। নির্বিচারে লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাসের সেল থেকে শুরু করে বন্দুকের গুলি— আন্দোলন থামাতে কোনো আয়োজনের খামতি ছিল না সেদিন।

২০১৮-র সেপ্টেম্বরের গোড়ায় বাংলা ভাষার শিক্ষকের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে দাড়িভিট বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। পরে সেই আন্দোলনে শামিল হয় স্কুলের প্রাক্তনীরাও। দাড়িভিট বিদ্যালয়ে সেই সময়ে একজন বাংলা ভাষার শিক্ষকের প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষার নির্দিষ্ট শিক্ষক না থাকায় পঠনপাঠনে অসুবিধায় পড়ত ছত্র-ছাত্রীরা। এই নিয়ে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের তরফে বেশ কয়েকবার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আবেদনও করা হয়। ঠিক এই সময়েই মহম্মদ শানাউল্লাহ নামে একজন উর্দু ভাষার শিক্ষককে নিয়োগ করে কর্তৃপক্ষ। বাংলা ভাষার শিক্ষক নিয়োগের পরিবর্তে উর্দু ভাষার শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলনে নামে।

বাঙ্গালি জাতির উপর এহেন অন্যায়ের প্রতিবাদে মাতৃভাষাপ্রেমী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, গ্রামের অন্যান্য তরুণ-তরুণী ও অভিভাবকরা সম্মিলিতভাবে আন্দোলন শুরু করেন। বাংলা ভাষা নিয়ে ছাত্র-যুবদের এই আন্দোলন ভয় ধরিয়েছিল স্বৈরাচারী শাসকের মনে। যখন সমাজের তরুণ রক্ত শাসকের চোখে চোখ রেখে কৈফিয়ত চায়, মসনদের পায়া তখন নড়ে ওঠে।

দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে উর্দু মাধ্যমের কোনও পড়ুয়াই ছিল না। অথচ গায়ের জোরে বাংলার সিলেবাস ইসলামীকরণের লক্ষ্যে সেখানে উর্দু শিক্ষক নিয়োগ করেছিল প্রশাসন। সেদিন উর্দু আগ্রাসনের সামনে মাথা নত করেনি দাড়িভিট। বিনিময়ে মমতা সরকারের কায়েমি সিদ্ধান্তের বলি হয় দুটি তাজা প্রাণ। ঘটনার দিন অকুস্থলে পায়ে গুলি লাগে বিপ্লব সরকার নামে আরও এক ছাত্রের। আহত ৫০ জনেরও বেশি ছাত্র-ছাত্রী। সেদিনের ক্ষত শুধু শারীরিক নয়, মানসিক ক্ষত তার চেয়েও প্রবল। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘটনার প্রায় এক বছর পর্যন্ত এলাকার পুরুষরা বাড়ি ছাড়া ছিলেন। পুলিশ যাদের বাগে পেয়েছে, মিথ্যা মামলায় তাঁদের ঠাঁই হয়েছে জেলহাজতে।

তিন বছর হতে চলল। আজও কোনও কিনারা হলো না দাড়িভিট কাণ্ডের। ২০১৮ পেরিয়ে ২০২১-এ ক্ষমতায় ফিরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশের নির্বাচনী সভায় ইসলামপুরে দাঁড়িয়ে বহু প্রতিশ্রুতির ঝুড়ি উজাড় করে দিলেও রাজেশ-তাপসের হত্যা প্রসঙ্গে তেমন কোনও আপ্তবাক্যও শোনেনি

দাড়িভিট। ২০ সেপ্টেম্বর ঘটনার নিজের দিন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে মুখ্যমন্ত্রী বলেই দিয়েছিলেন, 'পুলিশ গুলি চালায়নি, কে চালিয়েছে তা দেখা হচ্ছে।' তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, হঠাৎ ছুটে আসা গুলিতে মৃত্যু হয়েছে রাজেশ- তাপসের। মাননীয়ার এমন মন্তব্য ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন প্রলাপ। কারণ তখনও দাড়িভিট কাণ্ডের কোনও তদন্ত শুরু হয়নি। পরবর্তীকালে রাজ্য সরকার রাজেশ-তাপসের মৃত্যুর তদন্তভার তুলে দেয় সিআইডি-র হাতে। দাড়িভিটের কাছে যে তদন্ত এখনও নিষ্ফলা এবং প্রভাবিত বলেই বিবেচ্য।

ঘটনার দিন নিহত ও আহতদের বাড়ির লোক, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা, এলাকার মানুষ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা বারবার জানিয়েছেন পুলিশই গুলি চালিয়েছিল। মানবাধিকার সংগঠন 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' (এপিডিআর)-র পাঁচ সদস্যের দল এলাকায় অনুসন্ধান চালিয়ে তাদের সিদ্ধান্তে জানিয়েছিল, পুলিশের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে রাজেশ- তাপসের। পুলিশের চালানো গুলি পায়ে লেগেই আহত হয় বিপ্লব সরকার নামে ছাত্রটি।

সিআইডি তদন্তের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি নিহতদের পরিবার- পরিজন। মৃত তাপসের মা শ্রীমতী মঞ্জু বর্মন চেয়েছিলেন, তাপসের হত্যাকারীরা যেন শাস্তি পায়। নিরীহ আন্দোলনকারীদের উপর যে নির্মমতায় গুলি চালিয়েছে পুলিশ সেই অন্যায়ের বিচার হোক। রাজেশের বাবা নীলকমল সরকার চেয়েছেন সিবিআই তদন্ত হোক। রাজ্য সরকারের তদন্তের উপর কোনও আস্থা নেই তাঁদের। প্রতিবাদী দাড়িভিট কেন্দ্রীয় তদন্তের পক্ষে এখনও সওয়াল করে চলেছে। রাজেশ-তাপসরা সিবিআই তদন্তের বিচার পাবে কী না সেই সংক্রান্ত মামলা এখনও কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। আর ক'দিন পরেই আসছে অভিশপ্ত ২০ সেপ্টেম্বর। রাজেশ-তাপসের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী!

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায়, ১৯৬১ সালের ১৯ মে অসমের বরাক উপত্যকায়, আর ২০১৮-র দাড়িভিটে বারবার বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ওপর নেমে এসেছে বর্বোরোচিত আঘাত। প্রাণ বলিদান দিয়েছে ছাত্র-যুবরা। তবু আন্দোলন থেমে থাকেনি। মাতৃভাষা অমৃতসম। সেই অমৃতকুম্ভকে বুকে আগলে রাখতেই যুব-ছাত্রসমাজের এই বলিদান। রাজেশ-তাপসের আন্দোলনকে সামনে রেখে এখনও পথ হাঁটছে দাড়িভিট। দুটি প্রাণের বলিদানের স্বীকৃতির জন্য চলছে তাদের লড়াই। দাবি, ২০ সেপ্টেম্বর রাজেশের তাপসের মৃত্যুদিনটা ঘোষণা হোক এ রাজ্যের 'মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে। ২০২১-এর গোড়ায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শুরু করেছিল 'আমি দাড়িভিট বলছি' অভিযান। দাড়িভিট কাণ্ডে শাসকের অত্যাচারের প্রকৃত তথ্য পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে রাস্তায় নামে ছাত্র সংগঠনটি।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য সুমন দাস বলেন, 'আমি দাড়িভিট বলছি' অভিযানে রাজ্যজুড়ে আমরা ভালো সাড়া পেয়েছি। এই অভিযানের আওতায় বাংলা ভাষা নিয়ে পাঁচ দফা আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়েছে। সর্বস্তরের ছাত্র- ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের এই অভিযানে যোগদান করেছে। সমস্ত জেলার বিদ্যার্থীরাই জানিয়েছেন, তাঁরা দাড়িভিট বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার প্রতি শাসকদলের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ মেনে নিতে পারেনি। রাজেশ-তাপসের হত্যা তাদের মনে চেতনার ঝড় তুলেছে। তাই সময় থাকতেই মাতৃভাষার অক্ষুণ্ণ রাখতে এই অভিযানে শামিল হয়েছেন।'

সম্প্রতি এ রাজ্যে চোরাস্রোতের মতো বাড়তে থাকা বাংলা পঠনপাঠনের ইসলামীকরণ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন অনেক জাতীয়তাবাদী মানুষই। দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকাকালীন কংগ্রেসও দেশীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস মুছে দিয়ে ইসলামিক ইতিবৃত্তকে জোর করে গিলিয়ে এসেছে এতদিন। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বীরত্ব, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থাপত্যের অহংকার, শিক্ষার ঔজ্জ্বল্য ভুলতে বসেছিল ভারত! সেই ষড়যন্ত্রে জল ঢেলে দিয়ে আবার ভারতের নিজস্ব প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। ভারতের গর্বের ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে।

সেই কংগ্রেসের পথে হেঁটেই এ রাজ্যের তৃণমূল সুপ্রিমো বাংলা ভাষার উপর ঘৃণ্য আক্রমণ করে উর্দুর প্রাধান্য বিস্তার করতে চাইছেন। যে বাংলা ভাষায় লিখে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গলাকে বিশ্বমঞ্চে পরিচিতি দিয়েছিলেন সেই বাংলাভাষা আজ বিপন্ন! ২০১১-য় রাজ্যের পালাবদলের পর থেকেই বাংলা সিলেবাসের ইসলামীকরণ নিয়ে তিনি যথেষ্ট তৎপর। এই তৎপরতা ধাক্কা খেয়েছে দাড়িভিট বিদ্যালয়ের মাটিতে। তাই অস্ত্র উঁচিয়ে আন্দোলনকারীদের নিরস্ত করতে ছুটে গেছে পুলিশ। ছাত্রদের রক্তে লাল করেছে দাড়িভিটের মাটি।

ভারতকেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কটক অভিভাষণে বলেছিলেন, 'অন্য কোনো ভাষার ঊর্ধ্বে মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়ার নাম যদি প্রাদেশিকতা হয়, তাহা হইলে অকুণ্ঠচিত্তে বলিব, সে প্রাদেশিকতা আমাদের মধ্যে আছে এবং তাহা না থাকিলে আমরা সর্বহারা হইয়া যাইব।'

দেশ স্বাধীন। আমরা স্বাধীন নাগরিক। অথচ আজও আমাদের মাতৃভাষার বিপন্নতা গেল না। আজও মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিতে হয় রাজেশ-তাপসদের। এতে গদি আগলে বসে থাকা শাসকদের কোনো হেলদোল হয় না। অথচ আজও বিচারের আশায় রাজেশ-তাপসদের মৃতদেহ দিন গুনছে দাড়িভিটের গলঞ্চা নদীর পাড়ে। নিহত হওয়ার পর সনাতন ধর্ম মতে শ্রাদ্ধ-স্বস্ত্যয়নটুকু হয়নি দাড়িভিট কাণ্ডে আত্মোৎসর্গকারীদের।

পরিজনেরা বলেছেন যতদিন না সিবিআই তদন্তের আদেশ দিচ্ছেন মহামান্য আদালত, ততদিন সমাধিস্থই থাকবে রাজেশ-তাপসরা। এদিকে আদালতে তারিখের পর তারিখ আর শুনানির দিন-ক্ষণে আপন গতিতে বয়ে চলেছে গলঞ্চা নদীর স্রোত। তীরভূমিতে মাথা নোওয়ানো কাশফুলও দিন গোনে ভাষার জন্য আত্মোৎসর্গকারীদের বিচারের প্রতীক্ষায়! □

ভারতের কোনায় কোনায় লুকিয়ে থাকা তালিবানদের খুঁজে বের করুক সরকার

মনীন্দ্রনাথ সাহা

তালিবানরা আফগানিস্তান দখল করায় সমগ্র বিশ্বে হুলুস্থুল পড়েছে। তাতে গোটা পৃথিবী চিন্তিত হলেও আফগানিস্তানে তালিবানি শাসন মন জয় করেছে একাংশ ভারতীয়ের। যারা সামাজিক মাধ্যমে মন উজাড় করে সমর্থন করছে তালিবানদের। তারা কায়মনোবাক্যে চাইছে ভারতেও তালিবানি আধিপত্য কায়েম হোক।

সম্প্রতি খবরে জানা গেছে, অসমে তালিবানদের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা কম নয়। কে নেই সেই তালিকায়? আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের পড়ুয়া থেকে রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় মওলানা, পুলিশ ব্যাটেলিয়নের জওয়ান, শিক্ষক সকলেই রয়েছেন। যেহেতু তালিবানি সন্ত্রাসবাদীরা ভারতে নিষিদ্ধ সেহেতু তাদের সমর্থন করাও আইন বিরোধী। তাই অসমে 'অ্যাকশনে' নেমেছে সরকার ও পুলিশ। তালিবান সমর্থকদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও।

অসমে বসে যারা তালিবানকে সমর্থন করছে, তাদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ইতিমধ্যে ১৪ জন তালিবান সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, বলাবাহুল্য তারা প্রত্যেকেই মুসলমান। পুলিশ বলেছে খুব তাড়াতাড়ি আরও কিছু তালিবান সমর্থককে ধরা সম্ভব হবে।

যেখানে তালিবানি শাসন প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে শরিয়ত আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁরা অস্ত্রের মাধ্যমে শাসন চালায়। সাধারণ মানুষের কোনো অধিকার থাকে না, মহিলাদের সেখানে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আফগানিস্তানে ঘর থেকে মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখেছে সমগ্র বিশ্ব। কথায় কথায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মানুষকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তাই আফগানিস্তান থেকে পালাতে সাধারণ আফগান জনতার ছবি দেখে বিস্মিত সমগ্র বিশ্ব। টিভিতে দেখা গেছে আকাশে বিমান উড়তেই চাকায় বসে থাকা মানুষদের নীচে আছড়ে পড়তে।

তবুও এই ভয়ংকর তালিবানি শাসনের সমর্থন ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক মাধ্যমে। অসমেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। অসমে যে ১৪ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তারা হলো---চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র হাইলাকান্দির নাদিম আখতার, তেজপুর মেডিক্যাল কলেজের এমবিবিএস তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নাদিম, নাদিম ফেসবুকে যে পোস্ট দিয়েছিল তা ছিল উগ্র সাম্প্রদায়িক, দেশ বিরোধী ও প্ররোচনামূলক। দরং জেলার মওলানা ফজলুল করিম, যিনি জমিয়ত উলেমার অন্যতম প্রধান কার্যকর্তা। কামরূপ জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আবু বক্কর সিদ্দিকি ও মইদুল হককে। মইদুল আবার অসম পুলিশের ২১ ব্যাটেলিয়নের জওয়ান। একই অভিযোগে কাছাড় থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে জাভেদ মজুমদারকে, বরপেটা থেকে মজিদুল ইসলাম, ফারুক হুসেন খান, ধুবড়ি থেকে খন্দকার নুর আলম, গোয়ালপাড়া থেকে মওলানা ইয়াসিন খান, হোজাই থেকে মওলানা বসিরুদ্দিন লস্কর, করিমগঞ্জ জেলা থেকে মুজিবুদ্দিন এবং মোর্তাজা হুসেন খানকে।

ভারতের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাতে যদি ভালো করে তল্লাশি করে দেখা হয় তা হলে এরকম বহু আফগানি, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি অবৈধ নাগরিক ধরা পড়বে, যারা দেশেরই একশ্রেণীর লোভী ও দেশদ্রোহীদের সাহায্যে সুযোগসুবিধা নিয়ে চলেছে।

ফেসবুকে যারা তালিবানের সমর্থনে পোস্ট দিয়েছিল, তাদের প্রতি নজর রেখেছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন সাহসিকতার সঙ্গে কাজ করার। তিনি রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদনও জানিয়েছেন।

অসম ছাড়াও আফগানিস্তানে পালাবদলের পরই সারা ভারত মুসলিম পার্শোনাল ল' বোর্ডের মওলানা উইরাইন মাহফুজ রহমানি ও জাতীয় মুখপাত্র মওলানা সাজ্জাদ নোমানি একেবারে খোলাখুলি তালিবানদের সমর্থন করেছে। কলকাতায় জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় সভাপতি সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসাইনি আনন্দ ও সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছে 'আফগানিস্তানে ক্ষমতার হস্তান্তর শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে।' উত্তরপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ সফিকুল রহমান বলেছে—'তালিবানরা স্বাধীনতা সংগ্রামী। ওরা দেশকে স্বাধীন করেছে।'

ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল থেকে

৯জন আলকায়দা জঙ্গি ধরা পড়ার পর যে বিস্ফোরক তথ্য গোয়েন্দাদের হাতে উঠে এসেছিল তা হলো—ভারত-সহ গোটা উপমহাদেশে ইসলামি শাসনতন্ত্র অর্থাৎ খেলাফত কায়েম করতে চায় আলকায়দা। আলকায়দা ছাড়াও এরাজ্যে হুজি, জে এম বি, সিমি-সহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠন নিরাপদে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকারের প্রশ্রয়ে। উপরন্তু দেশের মাদ্রাসাগুলোকে অনেকেই জঙ্গি উৎপাদনের কারখানা বলেই মনে করেন। আর এখন তালিবানের সমর্থক কত যে আছে তার হিসেব পাওয়া মুশকিল। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সমগ্র দেশেই আজ জঙ্গিদের তৎপরতা ভীষণভাবে বেড়ে চলেছে দেশেরই কিছু রাজনীতিক ও মৌলবাদীদের প্রকাশ্য ও পরোক্ষ সমর্থনে।

এবারে তালিবান সম্পর্কে একটু জেনে নেওয়া যাক। ১৯৯৪ সালে তালিবানের পত্তন করেছিল মোল্লা মহম্মদ ওমর। ১২ জন শিষ্য তার সঙ্গী ছিল। তালিবান শব্দের অর্থ ছাত্র। দুর্নীতি ও অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ওই গোষ্ঠীর উৎপত্তি। ধীরে ধীরে তাদের লোকবল বাড়তে থাকে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত বাহিনীকে বিতাড়ন করে তালিবান। তখন থেকেই শক্তি বাড়তে থাকে তাদের। ১৯৯৬ থেকে পাঁচ বছর ধরে আফগানিস্তানে চলে তালিবানি শাসন।

২০০১ সালে সেখান থেকে তাদের উৎখাত করে মার্কিন সেনা। তখন আত্মগোপন করে ওমর। সেই সময় থেকেই কট্টর ইসলামপন্থী গোষ্ঠী আমেরিকার সঙ্গে লড়াই জারি রাখে। বর্তমানে হাইবাতুল্লাহ আখ্যুনজাদা তালিবানের শীর্ষ নেতা।

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকা তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া শুরু করলেই তালিবানরা আফগানিস্তান দখল নেওয়া শুরু করে। শেষে ১৫ আগস্ট তারা সমগ্র দেশের দখল নেয়।

দীর্ঘমেয়াদি কর্মকাণ্ড বজায় রেখে তালিবানরা শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছে। আর এই তালিবানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভারতীয় নাগরিকদের সংখ্যা মোটেও কম নয়। অসমের ধরাপড়া তালিবান সমর্থকরা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। দেশের প্রতিটি রাজ্য এবং দেশের কোনায় কোনায় অগণিত তালিবান ও তাদের সমর্থকরা ঘাপটি মেরে বসে আছে। সময় ও সুযোগ পেলেই তারা স্বমূর্তি ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়বে পুলিশ, প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের ওপর। এখনই যদি সরকার কড়া পদক্ষেপ না নেয় তাহলে দেশকে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

আরও জানা গেছে, ২১ জুলাই কেরলে আব্বাস খান ওরফে ইদগুল নামে এক আফগান নাগরিক ধরা পড়েছে। তার কাছে পাওয়া গিয়েছে অসম থেকে সংগ্রহ করা আধার কার্ড ও বিভিন্ন নথিপত্র। সেই সমস্ত ভুয়ো নথিপত্র ও স্কুল সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোচিন শিপইয়ার্ডে লিমিটেডে (সি এসল এল) কাজ জোগাড় করে নিয়েছিল। ভাবুন একবার! ভারতের প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাতে যদি ভালো করে তল্লাশি করে দেখা হয় তা হলে এরকম বহু আফগানি, পাকিস্তানি, বাংলাদেশি অবৈধ নাগরিক ধরা পড়বে, যারা দেশেরই একশ্রেণীর লোভী ও দেশদ্রোহীদের সাহায্যে সুযোগসুবিধা নিয়ে চলেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন্দ্র সরকারের ভাববার সময় এসেছে। যে সমস্ত গোষ্ঠী বা সংগঠন ভারতকে ক্ষতবিক্ষত ও টুকরো টুকরো করার চিন্তা নিয়ে কাজ করছে তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার। গণতন্ত্রের ফানুস আর ধর্মনিরপেক্ষতার অশ্বডিম্ব ছুড়ে ফেলে প্রথমে ভারতকে কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে এবং পরবর্তীতে শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের সবরকম নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার স্বার্থে আইন প্রণয়ন করা। তাতে কে কী বলল বা কাদের আঁতে ঘা লাগল সে চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই।

CAA নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন ও কৃষি আইন বাতিলের প্রতিবাদের নামে যে সমস্ত সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস ও মানুষ খুন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে সরকার কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি। গণতন্ত্রের নামে এরকম অরাজকতা কখনই কাম্য নয়। তাই প্রকৃত গণতন্ত্র রক্ষার জন্যই হিন্দুদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন প্রয়োজন বলে অনেকেই এখন মত প্রকাশ করছেন। কেন্দ্র সরকার এবিষয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করুক। নইলে ভারতের কোনায় কোনায় লুকিয়ে থাকা তালিবানরা মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে।

MUTUAL FUNDS Sahi Hai

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

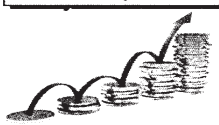

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথি মন দিয়ে পড়ুন।

যোগী আদিত্যনাথ হয়ে উঠছেন মোদীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী

রঞ্জন কুমার দে

আর মাত্র কয়েকমাস পেরিয়ে দেশের সবচেয়ে বড়োরাজ্য উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্যের সব মুখ্য রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মতো করে আসন্ন নির্বাচনের কুচকাওয়াজ শুরু করে দিয়েছে। দিল্লির মসনদ দখল উত্তরপ্রদেশ রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই স্বভাবতই সেখানের পঞ্চায়েত ভোটও সংস্থাপনের শিরোনামে জায়গা করে নেয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী সেই কারণে দিল্লি জয়ে দেশের সবচেয়ে বৃহত্তর রাজ্যে প্রভাব বিস্তারে নিজের রাজনৈতিক ঠিকানা বারাণসীতে অনেক আগেই পরিবর্তন করে নিয়েছেন। রাজ্যটির প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ইস্যু খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেই সুবাদে কয়েক মাস অন্তর অন্তর উত্তরপ্রদেশে সৃষ্টি হয় নতুন রাজনৈতিক টানাপোড়েন। ২০১৭-র বিধানসভা ও ২০১৯-র লোকসভায় বিরোধী শিবির অনেক সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করেও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন তো দূরের কথা, তারা ক্রমশ আরও তিমিরেই পৌঁছে গিয়েছে। ২০১৭-তে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলেও তাঁরা কোনো মুখ্যমন্ত্রীর মুখ সামনে এনে নির্বাচন লড়েনি। কিন্তু বিগত পাঁচ বছরে মুখ্যমন্ত্রী যোগীজী নিজের দুর্নীতিমুক্ত চেহারা এবং হিন্দুত্বের ফায়ারব্রান্ড নেতা হিসেবে দলের বাইরে ও ভিতরে শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং উনি হয়ে উঠেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। বৃহত্তর এই রাজ্যে অজস্র রাজনৈতিক ইস্যু জ্বলন্ত থাকলেও বিরোধী শিবিরে ঐক্যবদ্ধতার অভাবে যোগী অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী। ২০১৭-র আগে সপা-বসপা পালাক্রমে সরকারে বসলেও মোদীজীর নেতৃত্বে জাতপাতের রাজনীতিই বদলে যায়। অন্যান্য নির্বাচনের মতো ২০২২-এও উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিজেপির মূল অ্যাজেন্ডা থাকবে হিন্দুত্ব, জাতীয়তাবোধ ও উন্নয়ন। ২০১৭-তে রাহুল গান্ধী সাইকেলে চড়লেও কিংবা ২০১৯-এ তথাকথিত গেস্ট হাউজ বিতর্কের ইতি টেনে সপা-বসপার জোট হলেও আখেরে লাভ কিছুই হয়নি, বরং গেরুয়া ভোট আরও সংগঠিত হওয়ায় বিরোধীরা হয়ে গেছে কোণঠাসা। কংগ্রেস বারংবার প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে উত্তর প্রদেশে দাদি ইন্দিরার প্রতিচ্ছবি করে প্রমোট করলেও ভাগ্যের চাকা মোটেই ঘোরেনি। তাই প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজেদের পকেটভোট মজবুত করে দলিত, যাদব, জাট, মুসলমান ভোট একত্রিত করতে মরিয়া। কিন্তু এদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ও টার্গেট মূলত একই। তাই বিরোধী জোট ফাটলের চরম সম্ভাবনায় বিজেপি অবশ্যই খানিকটা স্বস্তিতে।

বেশ কিছুদিন মিডিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী যোগীজীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিভেদ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছিল এবং বিরোধীরাও সেটাকে যোগী-মোদীর ছন্দ পতনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টির খুব চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজেপির উত্তরপ্রদেশে জেলা পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৭৫ এর মধ্যে ৬৭ টি আসন জেতায় খোদ প্রধানমন্ত্রী যোগীজীর শাসন ব্যবস্থার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পার্টি অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাও বিজেপির এই বিজয়কে কেন্দ্র ও রাজ্যের দ্বৈত নীতির প্রতিচ্ছবি বলে উল্লেখ করায় যোগী বিরোধী সব জল্পনা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের জয় রাজ্যে পট পরিবর্তনের যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করে আছে, যেমন--- ২০১০-এ অধিকাংশ পঞ্চায়েত অধ্যক্ষ পদ শাসক বসপার পক্ষে গেলেও ২০১২ বিধানসভায় পর্যুদস্ত হয়ে যায়। একইভাবে ২০১৬-তে রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন তৎকালীন শাসকদল সপার অনুকূলে গেলেও ২০১৭-র বিধানসভাতে তাঁদের বিজেপির কাছে হার স্বীকার করতে হয়। তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনে অতিরিক্ত আত্মতুষ্টি বিজেপির হিতে বিপরীতও হতে পারে। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় বারংবার সরকার প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়েছে সেটা সরকারি হাসপাতালে অক্সিজেন সিলিন্ডারের গাফিলতিতে শিশুমৃত্যু হোক কিংবা গঙ্গায় ভেসে যাওয়া কোভিড শবই হোক না কেন। তবে যোগী আদিত্যনাথ কৌশলে ড্যামেজ কন্ট্রোলে খুব বেশি দেরি করেননি। বর্তমানে কেরলে ১ লক্ষ ১৫ হাজার এবং মহারাষ্ট্রে ১ লক্ষ ১৪ হাজার করোনায় সংক্রমণ আছে, সেই তুলনায় ভারতের জনসংখ্যার ১৭ শতাংশ উত্তরপ্রদেশে। গত এক মাসে মাত্র ১ শতাংশ সংক্রমণ সামনে এসেছে অর্থাৎ সেখানে মাত্র ১ হাজার ৬৮টি সক্রিয় রয়েছে। তাই সুদূর অস্ট্রেলিয়ার হিউজেস থেকে সাংসদ ক্রেগ অতি শীঘ্রই যোগীজীর শরণাপন্ন হতে সে দেশের সরকারকে অনুরোধ করেছেন। কৃষক আন্দোলন দিল্লির পর ইউপিতে সক্রিয় হওয়ার হুমকি বারংবার কেন্দ্র সরকারকে দেওয়া হচ্ছিল যাতে তাদের দাবি মেনে সরকার কেন্দ্রীয় কৃষি আইন বাতিল করে। রাজ্যের বিরোধী শিবির

আর.এল.ডি, সপা, কংগ্রেস এই ইস্যুটি নিয়ে তৎপরতার সঙ্গে অন্ততপক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব তোড়জোড় --- কে সরকার বিরোধী আন্দোলনে বেশি সক্রিয়। তবে কেন্দ্র সরকারের একাধিক যোজনায় যোগী সরকার বেশি সাফল্য, যেমন—প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি যোজনায় এই আগস্ট মাসের ৯ তারিখেও রাজ্যের প্রায় ২.৩৪ কোটি কৃষককে ৪৭২০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সাহায্য সরাসরি তাঁদের ব্যাংক একাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্বাচন ক্ষেত্র বারাণসী হওয়ার সুবাদে বিজেপির মাইলফলক এমনিতেই কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে, কারণ প্রধানমন্ত্রীও নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রের পাশাপাশি গোটা রাজ্যকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিয়েছেন। সেদিনও ইউপি সংক্রান্ত একটি সমীক্ষা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে অযোধ্যার বিকাশে সেখানে আধ্যাত্মিক কেন্দ্র, বৈশ্বিক পর্যটন ও স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা হবে। তবে হাথরস, বলরামপুরের মতো কয়েকটি ঘটনা গোটা রাজ্যের মাথা নীচু করে দিয়েছিল। বিরোধীরা উত্তরপ্রদেশকে ধর্ষণভূমি হিসাবে উপস্থাপনা করার যথেষ্ট চেষ্টা করলেও শুধু ২০১৯ সালের ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো রেকর্ডের হিসাব অনুযায়ী রাজস্থান উত্তরপ্রদেশের প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যা ৫৯৯৭ টি ধর্ষণকাণ্ড লিপিবদ্ধ। তবুও নারী সশক্তিকরণ ও সুরক্ষায় যোগী সরকার বেশ কয়েকটি যোজনা হাতে নিয়েছিল। যেমন শুধু মহিলাদের জন্য ৭৫ টি জেলায় ১৮১ নম্বরের হেল্পলাইন নম্বর, লিঙ্গ বৈষম্য ও গার্হস্থ্য হিংসার প্রতিরোধে 'পুলিশ সূচনা কার্যক্রম', বখাটেদের উৎপাত রুখতে 'অ্যান্টি রোমিও স্কোয়ার্ড' কার্যক্রম প্রভৃতি হাতে নেওয়া হয়েছিল। তবে মাত্র মাস দুয়েকের মাথায় অ্যান্টি রোমিও স্কোয়ার্ড কার্যক্রম উধাও হয়ে যায়, যদিও হাথরসকাণ্ডের পর যোগী সরকার 'মিশন শক্তি' কার্যক্রম শুরু করে রাজ্যের মহিলাদের সুরক্ষায় নতুন অভিযান শুরু করেছেন। ২০০৭ সালের বিধানসভায় বহেনজীর দল দলিত, মুসলিম, ব্রাহ্মণ ভোট একাট্টায় কেল্লা ফতে করেছিল, জয় মিম জয় ভীমের স্লোগানে হায়দরাবাদের ওয়েসির সঙ্গে প্রদেশে জোট সম্ভাবনা থাকলেও অবশেষে টিকিট বণ্টনের ভাগাভাগিতে জল আর বেশিদূর গড়ায়নি। ইউপির ৪০৩ বিশিষ্ট বিধানসভা আসনে বি এস পি-র অবস্থান ২০০৭ সালের ২০৬ আসন থেকে ২০১৭ সালে সেই আসনের সংখ্যা ১৯-এ এসে দাঁড়ায়। দলিত প্রধান এই দলের ছন্দপতনের পেছনে নিশ্চিত অনেকগুলো কারণ একসঙ্গে কাজ করেছে। নিন্দুকদের অভিযোগ, মায়াবতী নাকি দলিতদের বেটি থেকে দৌলতের বেটিতে পরিণত হয়ে গিয়েছেন, ভাইদের জন্য স্বজনপোষণের অভিযোগ, টিকিট বণ্টনে পয়সার লেনাদেনা, আয়ের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পত্তি, দুর্নীতি ইত্যাদি। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে মায়াবতীর দলের স্কোরবোর্ড শূন্য থাকলেও অখিলেশ যাদবের সঙ্গে গঠবন্ধনে ২০১৯ সালে সেই সংখ্যা দশে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু মায়াবতী অসন্তুষ্ট হয়ে সেই জোট অচিরেই ভেঙে দেন। তাঁর এই সিদ্ধান্ত স্থানীয় মুসলমান সমাজ মোটেই ভালোভাবে নেয়নি, তাদের সন্দেহ এই সিদ্ধান্তে বিজেপি পরোক্ষভাবে লাভবান হবে। কাশ্মীরে কেন্দ্রের ৩৭০ ও ৩৫-এ এর বিলুপ্তিকরণে সংসদে খোলা সমর্থন জানিয়েছিলেন, এমনকী দলের এক সাংসদ দানিশ আলিকে বিলটির সমালোচনা করায় লোকসভার নেতা পদ থেকে বহিষ্কৃত করেন। কেন্দ্রের নাগরিক সংশোধনী বিলেও মায়াবতী খুব নরম মনোভাব পোষণ করেছিলেন। তাই স্বভাবতই মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক তাঁর সেই আর অনুকূলে অবস্থানে নেই। ২০১৪ লোকসভা, ২০১৭ বিধানসভা, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জনসমর্থন ছিল যথাক্রমে ৪২.০৩%, ৪১.৩৫% এবং ৪৯.৮%। বিজেপির এই সাফল্যে অবশ্যই মোদীর জনপ্রিয়তা কাজ করেছে। প্রফেসর তথা রাজনীতি বিশ্লেষক গোবিন্দবল্লভ তাঁর পুস্তক 'রিপাবলিক অব হিন্দুত্বে' লেখেন সঙ্ঘ বিগত ৭০ বছর থেকে হিন্দুত্বের বীজ বপণে সেখানে জাতিগত অস্মিতার পরিবর্তন হয়ে অখণ্ড হিন্দুত্বের অস্মিতায় পরিণত হয়েছে, এরকম চলতে থাকলে ২০২২ আসতে আসতে বসপার হয়তো কোনো গ্রহণযোগ্যতাই আর অবশিষ্ট থাকবে না। সেটার আঁচ সম্ভবত বুঝতে পেরেই এক সময়ের প্রবল রামমন্দির বিরোধী মায়াবতী সফট হিন্দুত্বের কার্ড খেলে বলছেন বসপা সরকারে আগামীতে এলে রামমন্দিরের কাজ আরও দ্রুত গতিতে হবে। উত্তরপ্রদেশ রাজনীতিতে জাতপাতের সমীকরণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়, সেই সঙ্গে প্রত্যেকটা দলের কিছু সুনির্দিষ্ট পকেট ভোটও রয়েছে। তবে লখনউয়ের মসনদে বসতে হলে অবশ্যই কমিউনিটির বাইরে গিয়ে কিছু অন্যভোটও জোগাড় করে আনতে হবে, শুধু দলিত ভোট কিংবা যাদব ভোটে জয় পাওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যে ব্রাহ্মণ ভোটব্যাংক জোগাড় করে আনতে হবে, শুধু দলিত ভোট কিংবা যাদব ভোটে জয় পাওয়া সম্ভব নয়। রাজ্যে ব্রাহ্মণ ভোটব্যাঙ্ক প্রায় ১১-১২ শতাংশ রয়েছে, বসপার ২০০৭ সালে ব্রাহ্মণ সম্মেলন মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। সেই বছর তারা সর্বাধিক ৪১ জন ব্রাহ্মণ বিধায়ক নিয়ে মসনদে বসেন। ২০২১ সালেও সমাজবাদী পার্টি ব্রাহ্মণদের নিয়ে বিভিন্ন অভিযানের ফলস্বরূপ সেই বছরে তাঁদের পালে ২১ জন ব্রাহ্মণ বিধায়ক আসেন। ২০১৭ সালে গেরুয়া জয়ের পেছনেও ৪৬ জন ব্রাহ্মণ বিধায়কের অবদান ছিল। উত্তরপ্রদেশের একটা রাজনৈতিক ট্রেন্ড হলো সর্বাধিক ব্রাহ্মণভোট যেই দিকেই যায় তাঁরাই সরকার বানায়। সম্প্রতি রাজ্যে তথাকথিত কিছু ব্রাহ্মণ মাফিয়াদের এনকাউন্টারে বিরোধীরা একটু রাজনৈতিক জায়গা বানিয়ে নিতে একদিকে যেমন মায়াবতী আবার ব্রাহ্মণ সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, কংগ্রেস শিবিরও জিতেন প্রসাদের নেতৃত্বে 'ব্রাহ্মণ চেতনা মঞ্চ' নামে সংস্থা বানিয়ে ব্রাহ্মণ ভোট মেপে নিতে চাইছিলো। কিন্তু স্বয়ং জিতেন প্রসাদ এখন বিজেপিতে।

ভোটের দায় সত্যি অদ্ভুত। একসময়ের করসেবকদের বুকে গুলি চালানো মুলায়ম, তাঁর পুত্র এখন নিজেকে সবচেয়ে বড়ো হিন্দু সমর্থক। উনি পশ্চিমবঙ্গ মডেল অনুসরণ করে হোর্ডিং লাগাচ্ছেন 'খেলা হবে'। অখিলেশ যাদব দলিত ভোটব্যাঙ্ককে চাঙা করতে উদ্‌যাপন করছেন 'দলিত দিওয়ালি"। তৈরি করছেন 'বাবা সাহেব বাহিনী'ও। দলিত ভোটে ২০১৮ সাল থেকেই পাখির চোখ করে আছেন। আরেক দলিত যুবনেতা চন্দ্রশেখর রাও। রাজ্যের ২০% মুসলমান ভোট পুনরুদ্ধারে কংগ্রেস গঠন করেছে 'ইউপি সংখ্যালঘু ফ্রন্ট মাদ্রাসা'। ২০১৭তে প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে এআইএমআইএমের দলের প্রায় প্রত্যেকটি আসনের জামানত জব্দ হলেও ২০২২-এ পূর্ণ শক্তি দিয়ে আবার লড়তে আসায় স্বভাবতই ধর্মনিরপেক্ষ শিবিরে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী যোগী রাজ্যে ৪৪টি জনকল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়ণে এবং তাঁর সরকারের তথাকথিত এনকাউন্টারের ভয়ে অপরাধীদের খোদ থানায় যেভাবে আত্মসমর্পণ করতে হচ্ছে, তাতে পুরো দেশে মডেল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। তবে উত্তরপ্রদেশের ২০২২ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল অনেকটা নিশ্চিত করবে আগামীতে যোগীজী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কী না! ◘

ভারতবাসীর দেশভক্তি আরও বেশি জাগ্রত হোক

গত দেড় বছর ধরে করোনার দাপটে সারা বিশ্ব আতঙ্কিত, ত্রস্ত। ধৈর্য, সহনশীলতা, বুদ্ধি ইত্যাদি দিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে ব্যস্ত। এতোসব সমস্যার মধ্যেও নানা ভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতি সামলাতে সামলাতে গত বছর গলওয়ান সীমান্তে লাল ফৌজের আক্রমণ, সেনামৃত্যু, সেটাও সামলানো গেছে। হয়েছে নির্বাচন, চলছে রাজনৈতিক হিংসা, প্রতিহিংসা, মৃত্যু, ধর্ষণ, অপহরণ আরও অনেক কিছু।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে গেছে গত দশদিন ধরে একটা খবর যা সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। মৃতপ্রায় একটি উগ্রবাদী সংগঠন আবার স্বমহিমায় চলে এসেছে পূর্ণ শক্তি নিয়ে, শুরু হয়েছে হত্যালীলা। তাদের বর্বর ঘৃণ্য চরিত্র আবার ফুটে উঠেছে। তালিবান কথাটির অর্থ নাকি 'বাধ্য ছাত্র' আর এসব যদি হয় বাধ্য ছাত্রের কাজ, তাহলে অবাধ্য কারা? চরম উগ্রপন্থী, মৌলবাদীদের দ্বারা পরিচালিত যারা মেয়েদের পায়ের তলায় রাখতে চায় তথাকথিত ধর্মের দোহাই দিয়ে, তাদের সর্বশক্তিমানকে খুশি করতে।

এমন পাষণ্ড বর্বর নৃশংস অমানুষের দল যারা মাতৃজাতিকে ন্যূনতম সম্মান শ্রদ্ধা তো দূরের কথা শুধু কামনা বাসনা চরিতার্থের জন্য ব্যবহার করে তারা আর যাই হোক মানুষের শ্রেণীভুক্ত নয় বলে মনে করি। তালিবানদের কিছু কিছু সংগঠন এমনকী দেশও সমর্থন করছে ভারতকে শায়েস্তা করতে। পাকিস্তান ও চীনের ভূমিকা ভীষণ অমানবিক ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়মনীতির পরিপন্থী। সাময়িক ভাবে তালিবানদের বাড়বাড়ন্ত অনেককে খুশি করতে পারে কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি এটা সাময়িক। সারা বিশ্বে বন্দিত আমাদের দেশ এর আগে এই ধরনের অনেক হামলা, শত্রুতা, হিংসাকে বুদ্ধি, চিন্তা বিচক্ষণতা দিয়ে সামলেছে এবং এবারও তা সামলাবে বলে বিশ্বাস। দরকার সব রাজনৈতিক অরাজনৈতিক দল ও সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ভারত সরকারের পাশে দাঁড়ানো সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভ্রান্তি দূর করে, গর্বিত ভারতীয় হিসেবে।

আমাদের মধ্যে ভারতীয়তা বোধ আরও বেশি করে জাগ্রত হোক। বেশ কয়েকবছর আগে পাকিস্তানের এক স্কুল ছাত্রী ইউসুফজাই মালালা তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়ে সারা বিশ্ব তোলপাড় করেছিল, পরবর্তীতে সে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়। আফগানিস্তানের মেয়েরা কেন মালালার মতো হয়ে শয়তান তালিবানের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে পারবে না? এটা মানতেই হবে আগের তুলনায় আফগানিস্তানের বহু শান্তিকামী মানুষ তালিবানদের এই তাণ্ডব মানতে নারাজ। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে বিভিন্ন স্থানে, আরও খুশির খবর যে আফগান মহিলারাও রুখে দাঁড়াচ্ছেন নানা প্রান্তে, দেশের স্বাধীনতা দিবসে আফগানিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননায় তারা তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছেন, কেউ-বা পতাকা জড়িয়ে ধরে অশ্রুপাত করছেন। সেলাম জানাই দেশের প্রতি তাদের আস্থা ও শ্রদ্ধার জন্য। জয় হবে মানবিকতার, জয় হবে নারী জাতির।

—সজল কুমার গুহ,
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো মানুষ বড়ো বেশি প্রয়োজন

জীবনে চলার পথে এমন গুণী মানুষ দেখেছি যিনি বিদ্যাবত্তায় সমুজ্জ্বল, চরিত্রবলে মহীয়ান। কিন্তু নিজের বুদ্ধিমত্তা শুধু আর্থিক সমৃদ্ধির পেছনে ব্যবহার করেননি! নিজেকে নিয়ে গেছেন দেশের শুদ্ধ সংস্কৃতি, শিক্ষার সেবায়। কিন্তু সব সময় থেকে গেছেন এক অপূর্ব 'নিরভিমানতায়।' হাওড়া গার্লস কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী আমার কাছে এমনই এক মানুষ। বলা বাহুল্য তাঁর সঙ্গে মেলামেশা, আলাপ সেভাবে হয়নি! কিন্তু যেটুকু পরিচয় এই স্বল্প সময়ে পেয়েছি, তারই দু-চার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

আমি হাওড়া সদরের সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশন (ব্রাঞ্চ) স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছি। ১৯৬৬ সালে এপ্রিলের শুরু, সমাপ্তি ১৯৯৯-এর নভেম্বরে। স্কুলে সহকর্মী হিসেবে পেয়েছি 'বিদগ্ধ-মানস' মণিলাল বসুকে। প্রিয় মণিদা পরবর্তীকালে শিবপুর শিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। এরই মধ্যে বুদ্ধিজীবী হিসেবে কেশববাবুর নাম জেনে গেছি। আমার আগ্রহে ও মণিদার সহৃদয়তায় শিবপুরে এক সমাবেশে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। প্রথম দর্শনেই উনি আমাকে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। এরপর যখনই সুবিধে হয়েছে স্কুল থেকে ফেরার পথে হাওড়া ময়দানের নিকটস্থ গার্লস কলেজে ওনার সঙ্গে দেখা করে শ্রদ্ধা জানিয়েছি, আলাপ করেছি। প্রায় দিনই তাঁর পাশে আর একটি চেয়ারে অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে বসে থাকতে দেখেছি। বলাবাহুল্য, কেশববাবু তখন সহঅধ্যক্ষ ছিলেন।

একবার স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় উনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। কী বলেছিলেন মনে নেই! কেননা অনেক আগেকার কথা! তবে ভাষণের সুরটুকু আজও কানে বাজে। বলদৃপ্ত ভাষায় তিনি উপস্থিত ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও স্কুলের শুভানুধ্যায়ীদের সামনে ভারতবর্ষের সুমহান শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেছিলেন এবং সবাইকে ওইভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন।

আগে 'স্বস্তিকা'র বার্ষিক সমাবেশ ছোটো আকারে হতো। তা বলে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। দু-একবার তাঁকেও উপস্থিত থাকতে দেখেছিলাম। সভাপতির ভাষণে ওজস্বিনী ভঙ্গিতে পত্রিকার আদর্শ তুলে ধরে একে আরও বড়ো করার সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক আবেদন জানাতে কেশববাবুকে

ফঃ ৩

দেখেছি। এরপর স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে নেমে এল বিষণ্ণ কালরাত্রি। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে সেই সময়ের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার উদ্দেশে 'জরুরি অবস্থা' জারি করলেন! স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, প্রতিষ্ঠান চালানো বন্ধ হয়ে গেল! স্বাভাবিক কারণেই দেশের সুস্থ, সবল, নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরা এই 'স্বৈরাচারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হলেন। কেশববাবু সত্যাগ্রহ আন্দোলনে স্বাভাবিক কারণেই যুক্ত হয়ে গেলেন। ফলে তাঁকে কারাবাসে যেতে হলো। বিনা দ্বিধায় অন্যান্য বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তিনি এই কষ্ট স্বীকার করে নিলেন!

প্রায় দু-বছর চলার পর এই অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান হলো! বিনয়বাবু কারামুক্ত হয়ে আবার উদার উন্মুক্ত স্বাধীন পরিবেশে ফিরে এলেন, নিজের সুস্থ, সৎভাবনা নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। এই সময় কারাবন্দি ছিলেন এমন কয়েকজনকে তাঁদের কারারুদ্ধ চলাকালীন সময়ের প্রাপ্য বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। বিনয়বাবু নিলেন না এই বেতন। তিনি বললেন, 'আমি কারাবাসকালীন কোনো অধ্যাপনায় যুক্ত ছিলাম না, তাই ওই সময়ের কোনো আর্থিক সুবিধা নেবো না!' এই একটি কাজেই প্রমাণ করে দিলেন, তিনি নৈতিকতার কত বড়ো পূজারি! আজকালকার দিনে এই রকম চরিত্রবল দেখা যায় না।

জরুরি অবস্থার অবসানে, কারামুক্তির পর একদিন কলেজের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রাস্তায় ওনার সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেলে কিছু বলার আগেই সপ্রেমে আমাকে এমনভাবে আলিঙ্গন করলেন যা অবর্ণনীয়। বিদ্যার যে-'নিরভিমানতার' কথা আগে বলেছিলাম কেশববাবুর সম্বন্ধে, আরেকবার তারই পরিচয় উঠে এল। আমার বয়সের কনিষ্ঠতা তিনি বিবেচনার মধ্যে ধরেননি!

তাঁকে শেষবার দেখেছিলাম হাওড়া ময়দানে (বর্তমানে স্টেডিয়াম)। সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'রুদ্ধ অবস্থার' অবসান ও ভারতীয় 'মুক্ত, সুস্থ চিন্তার' পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্মরণে। সভায় মুখ্য বক্তা ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরসজী। সভা শুরুর কথা বিকেল ৪টে। একটু আগেভাগেই বসে আছি স্টেডিয়ামে। এমন সময় ঠিক ৪টে নাগাদ দেওরসজীকে নিয়ে কেশববাবু গাড়ি করে মাঠে প্রবেশ করলেন এবং মঞ্চে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সভার কাজ শুরু হয়ে গেল। এই 'নিয়মানুবর্তিতা' আমাকে মুগ্ধ করল।

দেওরসজীও 'জরুরি অবস্থায়' কারাবন্দি ছিলেন। ভাষণে দেওরসজী এই প্রসঙ্গ আনলেন না। ভারতের অমলিন শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মের প্রসঙ্গ প্রাণভরে ওজস্বী ভঙ্গিতে বলে গেলেন। বহুদিন আগের সভা। সভাপতির ভাষণে বিনয়বাবু 'নিয়ম' মেনে দু-এক কথায় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

সামান্য যোগাযোগে যেটুকু পরিচয় শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে পেয়েছি, তাঁর কথা বললাম। তাঁর মতো গুণী মানুষ বর্তমানে খুবই প্রয়োজন।

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৭০০০৩৬।

ভারতই ভারতের বড়ো শত্রু

এক সময় কতিপয় মুজাহিদিন ভারতীয় ও ভারতীয় বিপ্লবী পথভ্রষ্ট হয়ে অপবিত্র ভারতবর্ষ ছেড়ে আফগানিস্তান দিয়ে স্বপ্নের দেশ রাশিয়ায় পৌঁছে যায়। কেউ-বা ইসলামিক সাম্যবাদে, কেউ-বা মার্কসীয় সাম্যবাদে দীক্ষাগ্রহণ করে এই ভারতে ফিরে এলেও ভারতীয় মূল স্রোতের সঙ্গে মিশতে পারেনি। ব্রিটিশ ভারতে কেউ-বা তাঁবেদারি করে, কেউ-বা গুপ্তচরবৃত্তি করে, কেউ-বা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যতিব্যস্ত করতে থাকে। আজ স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর উদ্‌যাপনের পরেও একই অবস্থা দেখছি। সংস্কৃতিগত বিমুখ মানসিকতা ও অভ্যাস না থাকায় পতাকা উত্তোলন, প্রথমে হয় ভাইগ্যিস সেক সাহেব সামাল দেন। এরকম তেমনিই অনেক নামজাদা শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিকদের ধুমধাম সহকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে দেখা গেল না।

কয়েক বছর আগে, এই ধরনের সংস্কৃতিমনস্ক সজ্জনদের এক অংশকে বলতে শোনা গিয়েছিল যে, ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন, ধর্মনিরপেক্ষতা বিপন্ন, চলুন আমরা এ দেশ থেকে মুক্তি পেতে অন্য কোথাও চলে যাই। আজ নির্বাচিত আফগানিস্তানে ইসলামিক ক্যুপ হয়ে, গণতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতার যে অপমৃত্যু হলো, সে বিষয়ে কোনো এলিট সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের বা শিল্পীদের কলকাতার রাজপথে নেমে প্রতিবাদ করার লোকদেখানো সৌজন্যটুকুও দেখতে পেলাম না। অথচ এই পশ্চিমবঙ্গে তালিবান জঙ্গিদের স্বতঃস্ফূর্ত হুংকার ঘন ঘন শোনা যাচ্ছে।

বাংলাদেশের মতো দেশে আফগানিস্তানের অনৈতিক তালিবান জঙ্গি সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে রাজপথে নেমে মিছিল ও সমাবেশ হলে আশ্চর্য কিছু নয়। ভারতের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ভারতের অভ্যন্তরেই আছে, তত বড়ো শত্রু নেই চীন, রাশিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তান বা বাংলাদেশে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

With Best Compliments from-

A Well Wisher

ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার দায়িত্ব মেয়েদেরও

শুক্লা শিকদার

দুঃস্থ কর্মশীলা নারীদের সমবায় হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও 'সেবা' আজ ভারতে নারীদের ব্যাঙ্ক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেলফ হেল্প গ্রুপের মধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য বয়ে এনেছে মধ্যপ্রদেশের 'তেজস্বিনী' সমবায়ও। ২০১৫ সালে 'তেজস্বিনী' প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও ব্যতিক্রমী সাফল্যের নজির স্থাপন করে 'তেজস্বিনী' জিতে নিয়েছিল অতিরিক্ত ১৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার এবং প্রকল্প সময়ে সম্পূর্ণ করার জন্য ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল পরিষেবা। তেজস্বিনী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা রেখা প্রধান ও তার হাজার হাজার সমবায় সঙ্গীরা ভারতের পিছিয়ে পড়া জনজাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হয়েও স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের পরিবারের জীবনযাত্রায়ও আমূল পরিবর্তন এনেছেন।

১৯৯১-৯২ সালে যখন নাবার্ড সেলফ হেল্প গ্রুপের প্রচার শুরু করে তা ছিল ভারতের সেলফ হেল্প গ্রুপ কিংবা সমবায় সমিতিগুলোর জন্য বাস্তবিকই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তারপর ১৯৯৩ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াও সেলফ হেলফ গ্রুপের মাধ্যমে সেভিংস অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমোদন দেয়। তারপর প্রযুক্তিগত ভাবে ভারতে সেলফ হেল্প গ্রুপ কিংবা সমবায় সমিতি পরিচালনমার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো বাধা থাকেনি।

ভারতবর্ষে সেলফ হেল্প গ্রুপ তথা সমবায় সমিতি স্থাপন নারীর ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভরশীলতার বিকাশে অনুসৃত একটি যুগান্তকারী পন্থা। কারণ আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক কারণে সমস্যার সম্মুখীন, অসুরক্ষিত, লিঙ্গবৈষম্যের শিকার, সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া জাতিবর্গের মহিলাদের জন্য অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নিশ্চিতরূপে আলোর দিশারি হয়ে উঠতে পারে। ভারতে মুক্ত কৃষিবিলের শুভারম্ভে যেখানে কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও কৃষিনির্ভর বাণিজ্যের সুবিধা অনেক বেড়েছে সেখানে ভারতের গ্রাম-গঞ্জে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমবিনিয়োগকারী নারীরা আজও গভীর তিমিরেই পড়ে রয়েছেন। তাই সেলফ-হেল্প গ্রুপ বা সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে নারীদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদান, কৃষিক্ষেত্রে শ্রম বিনিয়োগকারী নারীদের আয়ের পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবেও বিবেচ্য হচ্ছে।

কৃষিক্ষেত্রের মতোই নারীদের সমবায় সমিতি গঠনের সুফল ভারতীয় নারীদের কুটির শিল্পের প্রতিটি ক্ষেত্রে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এছাড়াও কোভিড পরবর্তী জীবনযাত্রায় পরিষেবামূলক কাজের গুরুত্বও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে নারীদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং পরিষেবার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা নারীদের জন্য আজ আত্মনির্ভরশীলতার সহজ উপায়। তাছাড়া আজকের ভারতীয় নারী অনেক বেশি বহুমুখী। তাই ভারতীয় নারীদের বহুমুখী জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা ও সক্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে সমবায় গঠনের মাধ্যমে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ও সাফল্যের পরিসর প্রসারিত হয়েছে। গবেষণার ভিত্তিতে এটি আজ প্রমাণিত সত্য যে নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা তাদের নিজ নিজ পরিবারের খাদ্য সুরক্ষা এবং পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক। ভারত সরকারও ইউনাইটেড নেশনের 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম'-এ ভারতীয় নারীদের উদ্দেশে সমর্পিত 'মিশন শক্তি' প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বিশ্বের খাদ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে 'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম'-এ সাফল্যের জন্য নারীদের সেলফ হেল্প গ্রুপ তথা সমবায় সমিতি সমূহের মূল্যায়ন শুরু হয়। যার উদ্দেশ্য ছিল সেলফ হেল্প গ্রুপগুলির প্রয়োজন ও সমস্যা নিরুপণ এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা। তবে কর্মসূচি ও অর্থনৈতিক আদান প্রদানের তথ্য প্রতিনিয়ত লিপিবদ্ধ করা সেলফ হেল্প গ্রুপের সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত হলেও যে কোনো সেলফ হেল্প গ্রুপেরই উচিত সফল সেলফ হেল্প গ্রুপ সমূহের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা। যদিও আজ নারীদের ক্ষমতায়নের পথ দেখাচ্ছে ভারতীয় নারীদের পরিচালিত বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপ তথা সমবায় সমিতি। তবুও পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভারতের সবকটি রাজ্যে নারীদের সেলফ হেল্প গ্রুপ ছড়িয়ে পড়লেও সাফল্যের হার ভারতের গুজরাট রাজ্যে বেশি। গুজরাট রাজ্যে বিভিন্ন সেলফ হেল্প গ্রুপের সফল নারীরা নিজেদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে, সমাজের পিছিয়ে পড়া নারীদের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের নারীদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদানকারী বহু দেশে গুজরাটের নারীরা তাদের সাফল্যের জন্য সমাদৃতও হয়েছেন। তাই নারীদের সেলফ হেল্প গ্রুপের বিশ্ববরেণ্য 'গুজরাট মডেল' সমস্ত ভারতীয় রাজ্যই অনুসরণ করতে পারে আর বয়ে আনতে পারে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য, যা স্বনির্ভর ভারতের পরিপূরক হয়ে উঠবে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, নেট ব্যাঙ্কিং, মাইক্রো ফিনান্সিং প্রকল্পসমূহ এবং লোনের সুবিধা আজ নারীদের গৃহকোণ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পাথেয়। তবে আজ ভারতের নারীদের জন্য ক্ষমতায়নের রাস্তা অনেকটা মসৃণ হলেও একেবারে কণ্টকবিহীন নয়। নারীর স্বনির্ভরতার ও প্রগতির রাস্তাকে কণ্টকমুক্ত নারীদেরই করতে হবে, দিকে দিকে সাফল্যের বিজয়গাথা রচনার মাধ্যমে। □

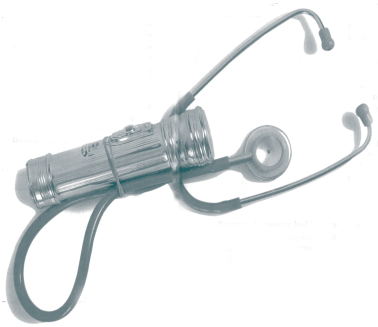

হোমিওপ্যাথিতেও পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অনেক রোগী প্রশ্ন করেন হোমিওপ্যাথি তো লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতে কি কোনো পরীক্ষানিরীক্ষার প্রয়োজন আছে? অনেকে আবার বলেন, এখন ডাক্তারদের মেধা কমে গেছে। আগেকার ডাক্তাররা নাড়ি টিপে রোগ ধরতে পারতেন। কিন্তু আগের দিনের মৃত্যুর হার ছিল ৮০ শতাংশ এখন দাঁড়িয়েছে সেখানে ৪০ শতাংশ। যাইহোক, পরীক্ষানিরীক্ষা প্রয়োজন আছে।

কী কী পরীক্ষানিরীক্ষা কখন করবে :

হাইব্লাডসুগারে :

● চার মাস অন্তর গ্লাইকোইলোটেড হিমোগ্লোবিন— HBAIC টেস্ট করান তিন মাসের সুগারের গড় রিপোর্ট দেয় এটি। দুটো HBAIC টেস্টের মাঝে অন্তত একবার করান সাধারণ সুগার টেস্ট।

● ক্রনিক সুগারের রোগী হলে মাইক্রো অ্যালবুমিন আর ক্রিয়োটিনিনের রেশিও দেখতে বছরে দু'বার এসিআর টেস্ট।

● সুগারে কিডনিতে ক্ষতি হচ্ছে কী না বুঝতে ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন টেস্ট বছরে দু'বার।

হাইব্লাড প্রেসারে :

● সপ্তাহে একদিন প্রেসার ব্লাড চেক-অ্যাপ করুন।

● হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি এড়াতে লিপিড প্রোফাইল বছরে দু'তিনবার জরুরি।

● ফুসফুসের কারণে হার্টের সমস্যার ঝুঁকি এড়াতে ডাক্তারের পরামর্শমতো টেস্ট এক্স-রে।

ফুসফুসে সমস্যা :

● চেস্ট এক্স-রে বছরে দু'বার।

● টিসিডিসি, ইএসআর, সিআরপি এইচএস করে লাং ফাংশন টেস্ট করতে হবে। সিওপিডি অ্যাজমার মতো ফুসফুস সংক্রান্ত অসুখে ভুগলে বছরে অন্তত দু'বার লাং ফাংশন টেস্ট জরুরি।

প্রস্টেট বড়ো : প্রস্রাব আটকে গেলে, রক্তক্ষরণ হলে বছরে দু'বার 'কেইউবি অ্যাল্ট্রসোনোগ্রাফি' করে প্রস্টেটের ওজন ও সাইজ জেনে রাখতে হবে।

● এর সঙ্গে পিএসএ ব্লাড টেস্ট বছরে দু'বার।

কিডনির সমস্যায় : ক্রিয়েটিনিন বর্ডার লাইনে বা তার একটু বেশি ঘোরাফেরা করলে রেনাল ফাংশন টেস্ট অর্থাৎ ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন, ইউরিক অ্যাসিড, ইলেকট্রোলাইট সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড টেস্ট তিন-চার মাস অন্তর করতে হবে। এর সঙ্গে বছরে দু'বার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। তবে ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন দু'মাস অন্তর করিয়ে নেওয়াই ভালো।

● ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা ৫-এর বেশি মানে কিডনি ফেলিওরের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আর বর্ডার লাইনের চেয়ে বেশি অর্থাৎ ২-৩-এর মধ্যে থাকলে দু'মাসে একবার ক্রিয়েটিনিন ও পটাশিয়াম টেস্ট করান। এর সঙ্গে রেনাল ফাংশন টেস্ট।

সোডিয়ম-পটাশিয়াম কমলে :

● বয়স্কদের প্রায়ই এমন হয়। সোডিয়াম-পটাশিয়াম আচমকা কমে যাওয়ার প্রবণতা থাকলে বছরে চারবার ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স দেখে রাখা উচিত। তার জন্য সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড-বাই কার্বোনেট এবং তার সঙ্গে ব্লাড প্রেসার টেস্ট করা জরুরি।

বাতের কষ্টে :

● অস্টিওআথ্রাইটিস বা বাতের যন্ত্রণায় ভুগলে ইউরিক অ্যাসিড, অ্যান্টি সিসিপি, আর এ ফ্যাক্টর, আরএ/এসও/সিআরপি ব্লাড টেস্ট করতে হবে।

● এর সঙ্গে যে অংশের হাড়ে যন্ত্রণা বা সমস্যা সেই জায়গায় এক্স-রে করে দেখতে হবে কতটা ডিজেনারেটিভ পরিবর্তন হচ্ছে। হাঁটু ছাড়াও শিরদাঁড়া-সহ যে কোনও জয়েন্টের ক্ষয় হলে এই টেস্টগুলি জরুরি। ট্রিটমেন্ট শুরু হওয়ার পর নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক্স-রে করে আগের প্লেটের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে দুটি জয়েন্টের মাঝে ফাঁক আরও বেড়ে গেল না কী এক আছে।

● এছাড়া যাদের আথ্রাইটিস নেই কিন্তু প্রবণতা আছে বা আগাম সতর্ক থাকতে মাঝে মাঝে বোন মিনারেল ডেনসিটি (বিএমডি) টেস্ট করে হাড়ের অবস্থা দেখে নিন। এতে বোঝা যাবে আপনি আথ্রাইটিসজনিত সমস্যার রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে আছেন না তার বাইরে আছেন। অস্টিওআথ্রাইটিসের রোগীরাও চেক করতে পারেন।

পলিসিস্টিক ওভারি থাকলে :

● এলএইচ, এফএসএইচ, প্রোল্যাকটিন, ইনসুলিন, ফাস্টিং পিপি ব্লাড সুগার ও ফ্রি টেস্টোস্টেরন টেস্ট করতে হবে।

থাইরয়েড : যাঁদের থাইরয়েড নেই কিন্তু হওয়ার প্রবণতা আছে তাঁরা টি থ্রি, টি ফোর, টিএসএইচটেস্ট ছ'মাস অন্তর করান।

● থাইরয়েড আক্রান্ত এবং তার ওষুধ খেলে করতে হবে এফটি-থ্রি, এফটি-ফোর ও টিএসএচি টেস্ট। দু' থেকে তিন মাস অন্তর। ডাক্তারের পরামর্শ মতো আর ঘন ঘন করতে হতে পারে।

অ্যানিমিয়া : আয়রন, টিআইবিসি, ফেরিটিন করে কমপ্লিট হিমোগ্লোবিন টেস্ট জরুরি। থ্যালাসেমিয়ার কারণে অ্যানিমিয়া কী না তা চিহ্নিত করতে জরুরি এইচবি ইলেকট্রোফোরেসিস টেস্ট।

লিভারের অসুখে :

● বিলিরুবিন, টোটাল প্রোটিন, অ্যাবুমিন, অ্যালকাফাস, এসজিপিটি করে লিভার ফাংশন টেস্ট করা উচিত। লিভারের যে কোনো গণ্ডগোলে এই টেস্ট করতে হবে।

বাংলা ভাষা বিকৃতির ফলে বাঙ্গালিদের চাকরি খাচ্ছে বাংলাদেশিরা

সাধারণ বাঙ্গালি এবং বর্তমান সরকার যদি একটু সচেতন হয় তাহলে বাংলাদেশের করাল গ্রাস থেকে আমাদের 'শুদ্ধ' বাংলা জানা শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের পথ রক্ষা হতে পারে।

দেবস্মিতা মুখার্জি

সম্প্রতি একটা সমীক্ষায় জানা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এখনও অধিকাংশই বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেন। যারা পশ্চিমবঙ্গে থাকেন এবং এই বঙ্গকে ভালো ভাবে চেনেন, তাদের কাছে এটা মোটেই কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। শুধু স্কুলস্তরে নয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও দেখা যাবে, বাঙ্গালির প্রিয় বিষয় হচ্ছে বাংলা। বেশিরভাগ বাঙ্গালি কলেজে পড়তে গিয়ে যে বিষয়ে অনার্স পড়ে বা ডিগ্রি অর্জন করে, সেটি হলো বাংলা। যারা অন্যান্য বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করেন, তারাও কলেজ স্তরে বাংলা মাধ্যমেই পড়াশোনা চালান। অতএব প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে বাঙ্গালির বাংলা-প্রীতি নিয়ে কোনো সন্দেহ রাখা চলে না। কিন্তু সমস্যা হলো পশ্চিমবঙ্গে প্রতি বছর এই যে এত এত বাংলা বিশেষজ্ঞ তৈরি হচ্ছে, এদের চাকরি দেবে কে? এরা কী কাজ করবে? বাংলা নিয়ে পড়ে কোনো কাজকর্ম কি পাওয়া যায় আদৌ? উত্তরটা একই সঙ্গে হ্যাঁ ও না। হ্যাঁ, কারণ এরকম চাকরি প্রচুর আছে। আর না, কারণ চাকরি থাকলেও সে চাকরি বাঙ্গালিদের জন্য নেই। এতএব দুটোরই খুব সঙ্গত কারণ আছে কিন্তু সেই কারণ শুনলে বেশিরভাগ বাঙ্গালিই চমকে উঠবেন।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো, এরকম হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ কাজ রয়েছে, যে কাজ করার অন্যতম যোগ্যতা হলো ভালো বাংলা জানা। এবং এইসব কাজে রোজগারের যথেষ্ট ভালো সম্ভাবনা আছে। আর কিছু কিছু কাজ তো এমনও আছে যেখানে আপনি পাবেন দেশে বসে বিদেশি আয়ের সুযোগ। অর্থাৎ আয় করবেন ডলারে আর খরচ করবেন ভারতীয় টাকায়। যেখানে এক ডলার মানে প্রায় ৭৫ ভারতীয় টাকা, সেখানে এরকম সুযোগ যে কতটা ঈর্ষণীয়, আশা করছি সেটা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। এবারে দেখে নিই কী কী সেই সব কাজ যেগুলো বাংলা ভালো মতন জানলেই করা যাবে এবং দুর্দান্ত রোজগার করা যাবে।

(১) **সাংবাদিকতা :** সাংবাদিকতারও নানা রকম আছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর অনেকেরই একটি করে বাংলা সংস্করণ আছে। যেমন ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা, বিবিসি বাংলা, সিএনএন বাংলা ইত্যাদি। আগামীদিনে নিশ্চয়ই আরও খুলবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই চ্যানেলের বাংলা শাখাগুলির প্রায় সবগুলোই হচ্ছে বাংলাদেশ কেন্দ্রিক। ফলে এই সব চ্যানেলের বাংলা সংস্করণে বাংলা ভাষা বলতে ব্যবহৃত হচ্ছে বাংলাদেশের উর্দু ফার্সি মিশ্রিত জগাখিচুড়ি

বাংলা। এবং এর ফলে এই চ্যানেলগুলোতে কর্মরত সাংবাদিক, সম্পাদক এবং অন্যান্য কাজে কর্মরত কর্মীর নিয়োগ হয় বাংলাদেশ থেকে।

(২) **অনুবাদক :** আপনি কি জানেন, গত দুই দশকে ডিসকভারি, হিস্ট্রি ইন্ডিয়া, অ্যানিমাল প্ল্যানেটের মতো কতগুলো বিশ্বব্যাপী ইংরেজি চ্যানেল নিজস্ব বাংলা সংস্করণ বের করেছে? আপনি কি জানেন যে, এখন বহু কার্টুন চ্যানেল নিজেদের অনুষ্ঠানগুলো বাংলায় অনুবাদ করাচ্ছে? যাতে বিশাল সংখ্যক বাঙ্গালি দর্শকের বাজার সম্পূর্ণ ভাবে ধরা যায়। ঠিক একইভাবে আজকাল বহু ইংরেজি, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ ও অন্যান্য ভাষায় তৈরি বিদেশি সিনেমা, সিরিয়াল, সিরিজ, ভিডিয়োর বাংলা অনুবাদ করা হচ্ছে অথবা বাংলা সাবটাইটেল তৈরি করা হচ্ছে। তামিল, তেলুগু সিনেমাগুলোও একই পথে হাঁটছে। বাংলা অনুবাদ করে সেগুলো ডাবিং করানো হচ্ছে। ডাবিং অর্থাৎ, বাংলায় অনুবাদ করা সংলাপ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে বসিয়ে দেওয়া। আর শুধু টিভি বা সিনেমাই কেন? পৃথিবীর বড়ো বড়ো প্রকাশনা সংস্থাগুলো নিজেদের বই বাংলায় অনুবাদ করাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি ওয়েবসাইট, বিভিন্ন কম্পিউটার সফটওয়্যারের নির্দেশিকা, সরকারি সতর্কবার্তা ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস এখন বাংলায় অনুবাদ হচ্ছে। আর বাঙ্গালির উদাসীনতায় এসব অনুবাদের সিংহভাগ কাজ ধীরে ধীরে বাংলাদেশিরা কুক্ষিগত করছে।

(৩) **অনুলিখন :** অনুলিখনকে ইংরেজিতে বলে ট্রান্সক্রিপশন। অনেকে অনুবাদ আর অনুলিখনের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন না। দুটোকে গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু এই দুটো কাজে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অনুবাদ মানে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় রূপান্তর। অর্থাৎ ইংরেজি থেকে বাংলায় করা বা বাংলা থেকে তামিলে করা। কিন্তু অনুলিখন মানে কিন্তু তা নয়। অনুলিখন হলো শুনে শুনে লেখা অর্থাৎ যেটা শুনছি সেটাই লেখা। আপনি বাংলায় শুনলে সেটাকে বাংলা লিপিতেই লিখবেন, বাংরেজি শুনলে বাংরেজি লিখবেন, ইংরেজি শুনলে ইংরেজিটাই লিখবেন, এরকম। এবারে প্রশ্ন হলো এগুলো কি কাজে লাগে? কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিকে শক্তিশালী করার জন্য মূলত অনুলিখনের দরকার হয়। কারণ বাংলা নানান ভাবে বলা যায়। কেউ 'আমি'-কে উচ্চারণ করেন 'আমি', কেউ 'আই', কেউ আবার 'আম্মি'! এত রকম বাংলা উচ্চারণ শুনে আমি বা আপনি হয়তো বুঝে নিতে পারব যে এর সবগুলোই 'আমি' বলা হচ্ছে। কিন্তু কম্পিউটার সেটা বুঝবে কী করে? এজন্যই অনুলিখন দরকারি। অনুলেখকের কাজই হলো শুনে শুনে বক্তব্যটা বোঝা আর তারপর সঠিক বানানে সেটাকে লেখা। এভাবেই কম্পিউটার এবং তার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাংলা বুঝতে শিখবে। বাঙ্গালিদের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কাজ। একবার যদি কম্পিউটার ভালোভাবে বাংলা শিখে যায় তাহলে বাঙ্গালিকে কম্পিউটার চালানোর জন্য ইংরেজি বুঝতে হবে না। বরং কম্পিউটারই বাংলা বুঝে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর বাংলায় দিতে পারবে।

(৪) **বাচিক শিল্পী :** রাস্তা চিনতে গিয়ে কখনো বিপদে পড়েছেন? সঠিক ঠিকানা খুঁজতে কখনো গুগল ম্যাপস ব্যবহার করেছেন? করে থাকলে আপনি জানবেন গুগল ম্যাপস ইংরেজিতে কথা বলে। কত ভালোই না হতো যদি গুগল ম্যাপস কোনো ঠিকানা খোঁজার রাস্তা আমাদের বাংলায় বলে দিত। স্পষ্ট ভাষায় বলত— 'এখান থেকে ডানদিক নিন, তারপর বাঁয়ে ঘুরুন। তারপর আর এক কিলোমিটার সোজা গেলেই বাঁদিকে পড়বে আপনার স্কুল।' দুঃখ করার কিছু নেই আবার দুঃখ করার মতো কিছু আছেও। কারণ এরকমটা সত্যিই হচ্ছে, গুগল ম্যাপের বাংলা সংস্করণ আসছে। অর্থাৎ বিশ্ব জুড়ে যত রাস্তাঘাট, বাড়ি, দোকানপাট আছে তার প্রতিটায় কীভাবে যেতে হবে, সেগুলোর সমস্ত পথ নির্দেশিকা বাংলায় রেকর্ড হচ্ছে। কিন্তু সেসব কাজ বাঙ্গালিরা পাচ্ছে না। পাচ্ছে বাংলাদেশি বাচিক শিল্পীরা। বাচিক শিল্পী মানে ভয়েস আর্টিস্ট। অর্থাৎ যখন গুগল ম্যাপ বাংলায় আসবে, চালু করলেই আমরা বাংলাদেশি বাচিক শিল্পীদের গলা শুনতে পাব— 'এইদিকে পানির ট্যাংক, ডানদিকে গোসলখানা, বাদিকে নাস্তাঘর।' মনে রাখবেন শুধু গুগল ম্যাপ নয়, এরকম লক্ষ লক্ষ ইংরেজি ভিডিয়ো বাংলায় রেকর্ড করাচ্ছে বহু সাইট, আর এই সমস্ত রেকর্ডিঙের কাজ পাচ্ছে বাংলাদেশি বাচিক শিল্পীর দল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কোভিড বিষয়ে সতর্কবার্তা যখন বাংলায় রেকর্ডিং হলো, ফেসবুক, টুইটার, গুগল ইত্যাদি সাইটগুলো নিজেদের সতর্কবার্তা আলাদা আলাদা বাংলা রেকর্ডিং করাল, এসব জায়গায় বাচিক শিল্পী হিসেবে কারা কাজ পেল? এখন অডিবল, স্টোরিটেল নামে গাদা গাদা অ্যাপ এসেছে যেখানে বই পড়া নয়, বই শোনা যায়। সানডে সাসপেন্স-এর মতো শুধু রহস্য রোমাঞ্চের গল্প নয়, সব রকম গল্প শোনা যায়। এই গল্পগুলো পড়ে শোনানোর কাজ পায় কারা? পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিরা না বাংলাদেশিরা?

(৫) **নেট গোয়েন্দা :** আপনি কি জানেন বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমগুলো যেমন, ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি নজর রাখে যে তাদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে কেউ অনৈতিক বা বেআইনি কোনো কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কিনা? কেউ ভুয়ো খবর ছড়িয়ে দাঙ্গায় উস্কানি দিচ্ছে কি না বা কেউ কোনো গোষ্ঠী, জাতি বা ধর্মের নামে ঘৃণা ছড়াচ্ছে কি না। এরাই হলো আজকের 'নেট গোয়েন্দা'। ঘণ্টা প্রতি বেশ ভালো পয়সা দিয়ে এদের রাখা হয় সামাজিক মাধ্যমগুলোয় খবরদারি ফলানোর জন্য। এখন বাংলা ভাষায় যত বেশি সামাজিক মাধ্যমগুলোতে লেখালেখি হচ্ছে, তত বেশি বাংলাভাষী নেট গোয়েন্দার চাহিদা বাড়ছে। বাংলাতে কিছু লেখা বা ভিডিয়ো শেয়ারের কারণে যদি আপনার প্রোফাইল ব্লক বা ডিঅ্যাকটিভেট করা হয় তাহলে জানবেন সেটা এইসব নেট গোয়েন্দাদের কাজ। এখন প্রশ্ন হলো, বাংলাভাষী হিসেবে কারা এসব কাজ পাচ্ছে? আমরা না ওরা?

এখানে কয়েকটা কাজের উদাহরণ দেওয়া হলেও এরকম প্রচুর কাজ আছে বাংলা ভাষায় করার মতো, যেগুলো পেলে বাঙ্গালির বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে। এসব কাজ করে মাসে ২৫-৩০ হাজার তো বটেই, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকারও বেশি আয় হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বাঙ্গালিরা এখনও বিশ্বাস করেন, 'গুণমান যার যার, কাজগুলো সবার' মার্কা তত্ত্বে। বাঙ্গালিদের বিশ্বাস হলো যে বাংলাদেশিদের নিয়ে হিংসে করে লাভ নেই। যার কাজের গুণমান ভালো হবে, কাজটা সেই পাবে। কিন্তু বাস্তবটা একেবারেই অন্য রকম। দখলদার বাংলাদেশিরা গুণমানের তোয়াক্কা করতে যাবে কেন? তারা তো ভাষার মানদণ্ডটাই পালটে দিয়েছে, যাতে

আমরা প্রকৃত বাঙ্গালিরা আমাদেরই ভাষার কোনো কাজ আর না পেতে পারি। নিজেদের ভাষার কাজ পেতে গেলেও যেন ওদের মতন বিকৃত বাংলা আমরা শিখতে বাধ্য হই। বিষয়টা একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলি। মনে রাখবেন, এই সব ক্ষেত্রে কাজ পেতে গেলে কিন্তু রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে নিজের বাংলা জ্ঞানের যোগ্যতা প্রমাণ করে ঢুকতে হয়।

এবারে যেহেতু প্রায় প্রথম থেকেই এইসব ক্ষেত্রের দখল গেছে বাংলাদেশিদের হাতে, তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমানে পরীক্ষা পদ্ধতিও সম্পন্ন হচ্ছে ওদেরই হাত ধরে। এবং যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের শুদ্ধ বাংলা এবং বাংলাদেশের আরবি, ফার্সি মিশ্রিত জগাখিচুড়ি বাংলা ভাষার মধ্যে অনেক তফাত তাই নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা এইসব ক্ষেত্রে সেই সব প্রার্থীদেরই বেছে নিচ্ছে যারা বাংলাদেশের বাংলা ভাষাতে সড়গড়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বুঝে নেওয়া যাক ব্যাপারটা। ধরুন আপনি ফেসবুক বা টুইটারের কাজের জন্য বাংলা অনুবাদকারী পদপ্রার্থী হিসেবে আবেদন করলেন। এবার আপনার সামনে কিছু পূর্বনির্ধারিত প্রশ্ন এল। তার মধ্যে হয়তো রইল ওয়াটার, গ্র্যান্ডমাদার, মাদার, ফাদার, এই শব্দগুলোর বাংলা অনুবাদ করতে দেওয়া হলো, আপনি কী লিখবেন? ওয়াটার মানে 'জল', গ্র্যান্ডমাদার মানে 'দিদা', মাদার ও ফাদার যথাক্রমে হলো 'মা' ও 'বাবা'। কিন্তু ধরুন আপনার সঙ্গে একটি বাংলাদেশি ছেলে বা মেয়ে এই পরীক্ষায় বসলো। তখন তার উত্তর হবে, ওয়াটার মানে 'পানি', গ্র্যান্ডমাদার মানে 'ন্যানি', মাদার মানে হবে 'আম্মু', ফাদার মানে হবে 'আব্বু'। এবার যিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন, তিনি যেহেতু নিজে বাংলাদেশি সুতরাং বাংলাদেশি পদপ্রার্থীটিকেই তিনি বেছে নেবেন। কারণ তার কাছে পানি, নানি, আম্মু, আব্বু এগুলোই সঠিক বাংলা। অথচ আসল সঠিক উত্তরগুলো দিয়েও প্রকৃত যোগ্য বাঙ্গালি পদপ্রার্থীটি এই চাকরির সুযোগ থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হবে। এই ভাবেই কর্মসংস্থান হারাচ্ছে আমাদের সুশিক্ষিত উৎকৃষ্টরূপে বাংলা জানা প্রজন্ম। এর ফলে বর্তমান প্রজন্ম ক্রমশ বাংলাভাষা বিমুখ হয়ে পড়ছে।

বর্তমানে বাঙ্গালি জাতির একটি বিরাট সমস্যা হলো শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে বাঙ্গালির অতিরিক্ত আদর্শ-প্রেম ও বাস্তব বিমুখতা। তারা জানে না তাদের আসল ইতিহাস। তাদের পূর্বপুরুষদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সম্পর্কেও বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ বাঙ্গালির ন্যূনতম ধারণা পর্যন্ত নেই। বাংলা ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস সম্পর্কে তারা অবহিত নয়। এই বিষয়টির প্রভাব সরাসরি পড়ছে রোজগারের বাজারে।

বর্তমান প্রজন্মের এই সমস্যাটির সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি হওয়ার এবং এর সমাধান খুঁজে বার করার সময় এসেছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। ভারত একটি বহু ভাষাভাষীর দেশ। এখনকার বাঙ্গালি প্রজন্ম অন্তত ৩টে ভাষা জানেই। বাংলা, হিন্দি ও ইংরেজি। বর্তমান বাঙ্গালি প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা ক্রমশ হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ছে। তার ওপর বাংলাভাষা অধ্যুষিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হারানোর ফলে বর্তমান বাঙ্গালি প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা শেখা, বলা, বাংলায় লেখালিখি করার উৎসাহ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

তাই সাধারণ বাঙ্গালির সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। সাধারণ বাঙ্গালি এবং বর্তমান সরকার যদি একটু সচেতন হয় তাহলে বাংলাদেশের করাল গ্রাস থেকে আমাদের 'শুদ্ধ' বাংলা জানা শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের জীবন ও জীবিকা নির্বাহের পথ আমরা রক্ষা করতে পারবো। □

বাঙ্গালি জাতিসত্তা বেদখলে বাংলাদেশের তিনটি মিথ

সুমিত রায়

বিগত কয়েক দশকে, অজস্র লেখালেখির মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে কয়েকটি ন্যারেটিভ জন্মলাভ করেছে। (১) ইলিয়াস শাহ সমগ্র বঙ্গপ্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ করে 'বাংলা' নাম রাখেন এবং এখানকার মানুষকে 'বাঙ্গালি' বলে পরিচিতি দেন। (২) ইলিয়াস শাহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেন, তার ফলেই বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে। (৩) হুসেন শাহের শাসনকালে, তার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটে। অর্থাৎ বাংলা ভাষা মুসলমানেরই ভাষা এবং বাঙ্গালি পরিচয় মুসলমানদেরই অবদান।

কীভাবে এই ন্যারেটিভের জন্ম? আসলে, অস্তিত্বের প্রতিটি মুহূর্তে বাংলাদেশি সত্তাকে একটি দ্বন্দ্বে ভুগতে হয়। তার পরিচয় কী— বাঙ্গালি না মুসলমান? ভারত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে, পাকিস্তানের সোপান পেরিয়ে যার জন্ম, তার পক্ষে আর যাই হোক মুসলমান পরিচয়টি ত্যাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলমান হওয়ার পাশাপাশি বাঙ্গালি হওয়া কি আদৌ সম্ভব? না সম্ভব নয়। ততদিন সম্ভব নয় যতদিন বাঙ্গালি বলতে প্রধানত পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালিকে বোঝায়। একদিকে বলা হয় 'ভাষার ভিত্তিতে গঠিত দেশ', অন্যদিকে বাঙ্গালি পরিচয় দিতে দ্বিধা, এই সমস্যার একটাই সমাধান সূত্র। সেটা হলো পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকে বাঙ্গালি সত্তাটি জবরদখল করে নেওয়া। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই জন্ম এই তিনটি ন্যারেটিভের।

প্রথম মিথ : ইলিয়াস শাহ বাংলা ও বাঙ্গালি নামক পরিচয়ের জনক।

এই মিথ খণ্ডন করার জন্য বাংলাদেশে সকলের শ্রদ্ধার্হ ভাষাবিদ ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) বক্তব্যই যথেষ্ট। শহিদুল্লাহ ছিলেন আদ্যোপান্ত পাকিস্তানি। তার কাছে ধর্মভাষা আরবির স্থান ছিল মাতৃভাষা বাংলার উপর। বাংলা ভাষাকে আরবি লিপিতে লিখতে সম্মত ছিলেন তিনি। শুধু দু' দশক সময় চেয়েছিলেন লিপি পরিবর্তনের। শহিদুল্লাহ স্বাধীন বাংলাদেশ দেখেননি। পূর্ব পাকিস্তান যে একদিন স্বাধীন বাংলাদেশ হবে, তাও কোনোদিন ভাবেননি। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য বাঙ্গালি সত্তাকে বেদখল করা কতটা প্রয়োজনীয় সেটা তিনি কোনোদিনই অনুভব করেননি।

বাঙ্গালি জাতিসত্তা মাত্র হাজার বছরের, এমন প্রমাণ করার কোনো রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না শহিদুল্লাহর। তাই বাংলা ভাষার উৎস নিয়ে গবেষণায় তিনি সরল মনেই তার মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে গৌড়ে প্রচলিত পূর্বী মাগধী প্রাকৃত বা গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি। তার মতে চর্যাপদের রচনাকাল সপ্তম থেকে একাদশ শতক। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক মহারাজা শশাঙ্কের রাজত্বকাল। যিনি স্বাধীন গৌড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যিনি গৌড়ের শাসনব্যবস্থা গৌড়তন্ত্র প্রণয়ন করেন, যিনি বঙ্গাব্দের প্রচলন করেন। তার আমলেই— যে বাংলা ভাষা পথ চলতে শুরু করবে সেটা খুব অসম্ভব কিছু নয়। বাংলা ভাষার সূচনাকাল থেকে ত্রয়োদশ শতকের তুর্কি আক্রমণ পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ বলে মনে করা হয়। এই সময়ের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের মধ্যে চর্যাগীতি, নাথ সাহিত্য, ডাক ও খনার বচন ইত্যাদি।

চর্যাপদের অন্যতম কবি ভুসুকু পাদ

লিখেছেন, 'বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ। অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়ি। আজি ভুসুকু বঙ্গালি ভইলী। নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' অর্থাৎ, ভুসুকু বজ্রনাওয়ে চড়ে পদ্মা নদীর পথে পাড়ি দিলেন অদ্বিতীয় বঙ্গাল দেশের উদ্দেশে। আজ থেকে তিনি বাঙ্গালি হলেন এবং এক চণ্ডালিনীকে বিবাহ করলেন। শহিদুল্লাহ ভুসুকুর সময়কালকে সপ্তম শতকের শেষার্ধ বলে মনে করেছেন। অন্যান্য গবেষকরা তাকে সম্রাট ধর্মপালের (শাসনকাল ৭৭০-৮০৬) সমসাময়িক বলে মনে করেন। ভুসুকুর চর্যা থেকে স্পষ্ট যে অন্ততপক্ষে অষ্টম শতকে, 'বঙ্গাল' একটি দেশবাচক শব্দ হিসেবে পরিচিত ছিল। 'বঙ্গালি' শব্দটিও একটি জাতিবাচক শব্দ হিসেবে পরিচিত ছিল। ঐতিহাসিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার তার 'দ্য হিস্ট্রি অব দ্য বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রাচীন চৈনিক বিবরণে বঙ্গদেশকে 'বঙলঙ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চৈনিক বিবরণ অনুযায়ী খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ভারতের 'বঙলঙ' থেকে একদল অভিযাত্রী বর্তমান দক্ষিণ ভিয়েতনামে (প্রাচীন নাম : আনাম) এসে বসতি স্থাপন করে এবং সাড়ে তিনশো বছর রাজত্ব করে। বিজয়চন্দ্রের মতে তৎকালীন আনামের ভাষায় '-লঙ' বিভক্তি, বাংলা ভাষার '-ল' বিভক্তির অনুরূপ। তার মতে '-ল'-যুক্ত দেশবাচক শব্দ 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গলা', জাতিবাচক শব্দ 'বঙ্গ' বা 'বঙ'-এর মতোই প্রাচীন।

শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বর্তমান ইরানের সিস্তান অঞ্চল থেকে দিল্লি হয়ে বাঙ্গলায় এসে নিজ প্রতিভাবলে বাঙ্গলার শাসনক্ষমতা লাভ করেন। তার রাজত্বকালের কোনো সরকারি ইতিহাস, শিলালিপি বা মুদ্রা পাওয়া যায় না। কলকাতায় বেনিয়াপুকুরে একটি মসজিদের গায়ে ফলকে উৎকীর্ণ একটি লেখ পাওয়া যায়, যা তার বলে মনে করা হয়। সেখানে তিনি নিজেকে 'শামস আদ-দুনিয়া যা আদ-দ্বীন আবু আল মুজাফফার ইলিয়াস শাহ' বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সেখানে তিনি নিজের রাজ্যকে 'বিশ্বের উপর আল্লাহর ছায়া' এবং নিজেকে 'মুসলিমদের রক্ষক' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেকে 'বাঙ্গলার শাহ' বা 'বাঙ্গলার সুলতান' বলেছেন এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক শামস সিরাজ আফিফ তার 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহি' গ্রন্থে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বলে উল্লেখ করেছেন। ফারসিতে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বলতে 'বাঙ্গলার শাসক' বোঝায়, কোনো বিশেষ উপাধি নয়। বস্তুত, সেকালের সুলতানরা যেসব উপাধি বা খেতাব গ্রহণ করতেন তা লিখতে দু'তিন লাইন লেগে যাবে, মাত্র দু'টি শব্দে তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাছাড়া দিল্লির সুলতান তার বাঙ্গলা অভিযানে সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের বিরুদ্ধে সফল হননি। তাই তার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত ইতিহাসে তারই শত্রুকে এমন কোনো উপাধিতে ভূষিত করা হবে, যা তার শত্রু নিজেই ব্যবহার করতেন না, এমন ভাবা বাতুলতা। দেশবাচক শব্দ হিসেবে 'বাঙ্গলা' পরিচিত ছিল বলেই দিল্লির সুলতানের পেশাদার ইতিহাসকার ইলিয়াস শাহকে সাধারণভাবে 'বাঙ্গলার শাসক' বলে উল্লেখ করেছেন মাত্র। 'শাহ-এ-বাঙ্গালাহ' সত্যিই যদি রাষ্ট্রীয় পরিচয় বহনকারী একটি গৌরবময় খেতাব হতো, তাহলে তার উত্তরসূরীরাও নিশ্চয় নিজেদের 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' বলতেন। কিন্তু তার পর আর কোনো শাসক এমন খেতাব নিয়েছেন বলে জানা যায় না। তার পুত্র সিকান্দার শাহ নিজেকে আরব, পারস্য ও ভারতের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু 'বাঙ্গলার সুলতান' বলে নিজেকে উল্লেখ করেননি।

দ্বিতীয় মিথ : ইলিয়াস শাহ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করেন, তাতেই বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটে। ইলিয়াস শাহ যেমন নিজেকে 'বাঙ্গলার শাহ' বা 'বাঙ্গলার সুলতান' বলে দাবি করেননি, তেমনই ফারসির পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করেছেন, এমন কোনো দাবিও তিনি করেননি। বাংলা ভাষা যদি সত্যিই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়ে থাকত, তাহলে মুদ্রায় ফারসির পাশাপাশি বাংলাতেও লেখা থাকত, ঠিক যেমন পাকিস্তানের ব্যাঙ্কনোটে উর্দু ও বাংলা দুটি ভাষাতেই লেখা থাকত। মসজিদের ফলকে এবং অন্যান্য লেখগুলিতে ফারসির

পাশাপাশি বাংলা ভাষাতেও লেখা হতো। বাঙ্গলায় ইলিয়াস শাহি বংশের শাসন চলে ১৩৪১ থেকে ১৪৮৭ পর্যন্ত, মাঝের ১৪১৫ থেকে ১৪৩৫ সময়কালটুকু বাদ দিয়ে। অথচ এই দেড়শো বছরে একটা সরকারি মুদ্রা বা লেখ দেখা যায় না যেখানে বাংলা ভাষায় কিছু লেখা আছে।

বাংলাদেশে একটি প্রচলিত বিশ্বাস হলো ইলিয়াস শাহের শাসনকালেই বড়ু চণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনা করেন। যেন ইলিয়াস শাহের পৃষ্ঠপোষকতাতেই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হয়েছিল। এই দাবির পেছনে দুটি বৃহৎ ফাঁকি আছে। প্রথমত, বড়ু চণ্ডীদাসের সময়কাল ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়ে মতভেদ আছে। সাধারণভাবে চতুর্দশ শতক হিসেবে ধরা হয় ঠিকই, কিন্তু চতুর্দশ শতকে ইলিয়াস শাহ জীবিত ছিলেন না। কবি নিজেও তার রচনায় কোনো শাসকের গুণগান বা নাম উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম ও কর্মস্থল বীরভূম জেলার নানুর বা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা যাই হোক না কেন, এই দুইয়ের কোনোটাই ইলিয়াস শাহের অধীনে ছিল না। বাঁকুড়ায় তখনও মল্ল রাজাদের স্বাধীন বিষ্ণুপুর রাজ্য এবং বীরভূমে বীর রাজাদের স্বাধীন রাজ্য বিদ্যমান। ফলে ইলিয়াস শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচিত হয়েছে, এই দাবির কোনো সারবত্তা নেই।

ইলিয়াস শাহ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন, এই ন্যারেটিভের পরোক্ষ সমর্থনে দুটি বিশ্বাস কাজ করে— (১) বৈদিক যুগে আর্যাবর্তের মানুষ বাঙ্গলার মানুষের ভাষাকে ঘৃণা করত, (২) সেন বংশের শাসনকালে বাংলা ভাষাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রথমটির প্রমাণ হিসেবে ঐতরেয় আরণ্যকের একটি শ্লোককে উপস্থাপিত করেন তারা।

'ইমাঃ প্রজাস্তিস্রোৎ অধ্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যান্যা অকর্ম ভিতো বিবিশ্র ইতি।।'

'বয়াংসি' শব্দটার আক্ষরিক অর্থ 'পক্ষীজাতীয়'। গবেষক ড. অতুল সুরের মতে, এর থেকে বোঝা যায় যে, বঙ্গ ও মগধের অধিবাসীদের টোটেম ছিল পাখি। কিন্তু যারা বাঙ্গালি পরিচয় বেদখল করতে চান, তারা সেটা মানবেন কেন। তাদের মতে 'বয়াংসি' কথাটার মধ্যে দিয়ে বলা হয়েছে বঙ্গের অধিবাসীদের মুখের ভাষা পাখির কিচিরমিচিরের মতো দুর্বোধ্য। অর্থাৎ, আর্যরা বাঙ্গলার মানুষের ভাষাকে ঘৃণা করতেন। দ্বিতীয়টির প্রমাণ হিসেবে তারা দীনেশচন্দ্র সেনের উল্লিখিত একটি সংস্কৃত শ্লোককে হাজির করে। 'অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ। ভাষাণাং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।' এর আক্ষরিক অর্থ হলো, অষ্টাদশ মহাপুরাণ বা রামায়ণ যে মানবসৃষ্ট ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত বাদে অন্য কোনো ভাষায় যে শুনবে সে নরকে যাবে। দীনেশচন্দ্র সেন এই শ্লোকের রচনাকাল বা কোনো সূত্র উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন শ্লোকটি ব্রাহ্মণদের মধ্যে চালু ছিল। যেহেতু সেন বংশীয় শাসকরা ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তাই বাঙ্গালির পরিচয় বেদখলকারীরা মনে করেন এই শ্লোক সেন বংশের শাসনকালেই প্রচলিত ছিল এবং এরই ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে সেই সময়ে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

তাহলে যুক্তিটা দাঁড়াল এই রকম, আর্যরা বাংলা ভাষা ঘৃণা করত, ব্রাহ্মণরা বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করেছিল, সুতরাং মুসলমান শাসকরাই নিশ্চয় বাংলা ভাষাকে পুনরায় উদ্ধার করেছিল। তাহলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার কৃতিত্ব কাউকে দিতে হয়। কিন্তু দিতে হলো কাকে? ইলিয়াস শাহের থেকে আর উপযুক্ত কেউ আছে নাকি? তাকেই তখন 'বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ'-এর জনক বলা হচ্ছে, এই কৃতিত্বও তাকে দিলে বরং তার 'বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ'-এর জনকের দাবি আরও শক্তপোক্ত হবে।

তৃতীয় মিথ : হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটে।

বাংলাদেশে চালু আর একটি ন্যারেটিভ হলো, হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ হয়। তার শাসনকালকে বাংলা সাহিত্যের 'নবযুগ' বলা হচ্ছে। এই দাবির পক্ষে মূলত চারটি সাহিত্যকর্ম দেখানো হয়— (১) কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়', (২) শ্রীকর নন্দীর 'জৈমিনি ভারত'-এর আংশিক বঙ্গানুবাদ, (৩) যশোররাজ খাঁর 'কৃষ্ণমঙ্গল', (৪) বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ'।

কবীন্দ্র পরমেশ্বরের 'পাণ্ডববিজয়'কে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মহাভারত বলে মনে করা হয়। হুসেন শাহের রাজত্বকালের শেষ দিকে, চট্টগ্রামের আঞ্চলিক শাসনকর্তা পরাগল খাঁর নির্দেশে তিনি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদটি করেন। পরাগল খাঁর পরবর্তী শাসনকর্তা তারই পুত্র ছুটি খাঁর নির্দেশে শ্রীকর নন্দী জৈমিনি রচিত মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের বঙ্গানুবাদ করেন। পরাগল খাঁর পিতা রাস্তি খাঁও ইলিয়াস শাহি আমলে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। তারা ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত। বংশানুক্রমিকভাবে তারা চট্টগ্রামের শাসনকর্তা হওয়ায় বাংলা না পড়তে পারলেও, সম্ভবত বুঝতে পারতেন। পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ তাদের শাসনকালের অধিকাংশ সময় গৌড় সুলতানের পক্ষে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। শত্রুর মানসিকতা বোঝার জন্য তার ধর্মগ্রন্থের পাঠ নেওয়া বিচিত্র কিছু নয়। পরাগল খাঁ মহাভারতের কাহিনি শুনতে চেয়েছিলেন বলেই কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে বাংলায় অনুবাদ করার নির্দেশ দেন। ছুটি খাঁর ক্ষেত্রেও একই যুক্তি কাজ করেছে। এই সাহিত্য দুটি রাজসভার বাইরে সাধারণ বাঙ্গালি সমাজে কাশীদাসী মহাভারতের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। এই সাহিত্যকর্মগুলির পেছনে হুসেন শাহের কোনো অবদান নেই বললেই চলে। যদি থাকত তাহলে সপ্তগ্রাম, সোনারগাঁও এবং অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তারাও এমন সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু তেমন কোনো সাহিত্যের কথা জানা যায়নি। যশোরাজ খাঁর প্রকৃত নাম দামোদর সেন। তার রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল'-এর একটি পদ পাওয়া যায় মাত্র। পদটি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত, বাংলায় নয়। সেই পদে হুসেন শাহের উল্লেখ থাকায় ধরে নেওয়া হয় তিনি গৌড়ের দরবারে কবি ছিলেন এবং 'কৃষ্ণমঙ্গল' রচনা করেই 'যশোরাজ খাঁ' উপাধি পেয়েছেন। মনসার অপর নাম পদ্মাবতী বলে বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন 'পদ্মাপুরাণ' নামে।

দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে কবি এই মঙ্গলবাক্য রচনা করেন, কোনো রাজ অনুগ্রহে নয়। যদি রাজ অনুগ্রহ পেতেন তাহলে তারও 'গুণরাজ খাঁ' বা 'যশোরাজ খাঁ'-র মতো একটা উপাধি জুটত, কিন্তু তেমন কোনো উপাধির কথা জানা যায়নি। 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের রচনাকাল নিয়েও বিভ্রান্তি আছে। বিজয় গুপ্ত নিজেই লিখেছেন ১৪০৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৮৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনার কাজ শুরু করেন এবং সেই সময়ে শাসক হুসেন শাহ। অথচ ১৪৮৪-তে বাঙ্গলার শাসক জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ এবং ১৪৯০-এর আগে বাঙ্গলায় আলাউদ্দিন হুসেন শাহর কোনো কার্যকলাপের কথা জানা যায়নি। জৌনপুরের শেষ স্বাধীন সুলতানের নাম হুসেন শাহ শারকি। তিনি ১৪৭৯ সালে দিল্লির সুলতান বাহলুল লোদীর কাছে রাজ্য খুইয়ে বাঙ্গলাতেই আশ্রয় নেন এবং নিজ রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যান ১৪৯৪ পর্যন্ত। বিজয় গুপ্তের উল্লিখিত হুসেন শাহ ইনি কিনা, এবং হলে কেন, তা নিয়ে গবেষণার অবকাশ আছে। তবে এটুকু নিশ্চিতভাবেই বলা যয়ে যে বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল রচনায় আলাউদ্দিন হুসেন শাহর পৃষ্ঠপোষকতার কোনো প্রমাণ নেই। এখানে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, যে সাহিত্যকর্মগুলি আপাতভাবে রাজ অনুগ্রহে রচিত হয়েছে এবং রচনাকাররাও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের থেকে উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন বলে মনে করা হয়, সেই সাহিত্যকর্মগুলি সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়নি। যে রচনা যত জনপ্রিয় হবে, তার পুঁথি তত বেশি নকল হবে এবং বর্তমান সময়ে পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়বে। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়, কিন্তু যশোরাজ খাঁর কৃষ্ণমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া যায়নি।

শাসক আরব মুসলমান ও সংখ্যাগুরু প্রজাই বাঙ্গালি হিন্দু। সংখ্যাগুরু প্রজার কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করতে শাসককে তো অন্তত প্রতীকী কিছু করতে হবে। হুসেন শাহ শুধু সেটুকুই করেছেন। জন্মসূত্রে হুসেন শাহ ছিলেন মক্কার সৈয়দ বংশীয় আরব। তিনি বর্তমান উজবেকিস্তানের তিরমিজ শহরের থেকে ভাগ্যচক্রে বাঙ্গলায় আসেন ও স্বীয় প্রতিভাবলে হাবশি রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে

যত দিন যাবে বাঙ্গালি পরিচয়ের সমস্ত কিছু একে একে দখল হয়ে যাবে এবং বাঙ্গালি ধীরে ধীরে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হতে থাকবে। তারপর একসময়ে বিলীন হতে আর বেশি সময় লাগবে না।

গৌড়ের শাসন ক্ষমতা দখল করেন। তাঁর ২৫ বছরের রাজত্বকালে (১৪৯৪-১৫১৯) তিনি দিল্লি (১৪৯৪), কামাতা (১৪৯৮-১৫০২), ওড়িশা (১৫০৮-০৯) প্রতাপগড়, ত্রিপুরা (১৫১৩-১৪) ও আরাকানের (১৫২১-১৬) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তার শাসনকালের শেষ পর্যন্ত ওড়িশা ও ত্রিপুরার সঙ্গে ছোটোখাটো যুদ্ধ লেগেই থাকত। যুদ্ধ করেই প্রায় গোটা শাসনকালটা অতিবাহিত হয়েছে। এই যুদ্ধের আবহে সাহিত্যের প্রতি আদৌ কতটা অনুরাগ দেখানো সম্ভব সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

হুসেন শাহের ৪১টি শিলালিপি ও অন্তত পক্ষে ১৫ ধরনের মুদ্রা পাওয়া যায়। অথচ একটাতেও বাংলা লিপিতে কিছু লেখা নেই। তার দরবারে বেশ কিছু বাঙ্গালি অমাত্য ছিলেন বটে। তাদের নানাবিধ উপাধি ছিল— দবির খাস, সাকর মল্লিক ইত্যাদি। প্রতিটি উপাধিই ফারসি ভাষায়। বাংলা ভাষায় কারুর কোনো উপাধি ছিল না। যে রাজ দরবারে বাংলাভাষাই ব্রাত্য, সেই রাজ আনুকূল্যে বাংলাভাষার নবজাগরণ হয়েছিল, এ নেহাতই কষ্টকল্পনা।

হুসেন শাহের রাজত্বকাল বিখ্যাত মহাপ্রভু চৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনের জন্য। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নবদ্বীপের কাজির সংঘাত সর্বজনবিদিত। হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন ভালো চোখে দেখেননি। বস্তুত তার রোষানলে পড়ার ভয়েই মহাপ্রভুকে দেশত্যাগ করে ওড়িশায় আশ্রয় নিতে হয়। হুসেন শাহ ওড়িশা আক্রমণকালে মন্দির ধ্বংস করেন বলে জানা যায়। মন্দির দখল করে মসজিদ বানানোর কৃতিত্ব আছে তার। বাঙ্গলাতেই মঙ্গলকোটের কাছে নতুনহাটে এমন মসজিদ আরও দেখা যায়। সনাতন ধর্মের প্রতি এমন মনোভাব নিয়ে কি কারুর পক্ষে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা আদৌ সম্ভব, যেখানে প্রতিটি সাহিত্যকর্মেই সনাতন ধর্মের দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে?

আসলে, বাঙ্গালি পরিচয় দখলকারীদের ঊনবিংশ শতকের মতো বাংলা সাহিত্যে একটা নিজস্ব নবজাগরণ প্রয়োজন। ইতিহাসের কালক্রমে তা ঊনবিংশ শতকের আগেই হতে হবে। কিন্তু তার আগে তো ইসলামি বাংলায় লেখা পুঁথি সাহিত্য ছাড়া কিছুই নেই। আর সে পুঁথি সাহিত্য যে কারুর পাতে দেবার যোগ্য নয় সে জ্ঞানটুকু আছে। তাই মুসলমান লেখকের সাহিত্যকর্ম না হোক, মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নবজীবন লাভ করেছে সেটা দেখাতে পারলেই হবে। হুসেন শাহের শাসনকালকে যখন বাঙ্গলার স্বর্ণযুগ' বলাই হচ্ছে, তখন তাকেই বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের কৃতিত্ব দেওয়া হোক।

বাঙ্গালির ভাষা ও জাতিসত্তা এভাবেই বাংলাদেশিদের হাতে বেদখল হয়ে যাচ্ছে— আলপনা থেকে শুরু করে মাছের ঝোল। বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যে বাঙ্গালির জনসংখ্যার আনুপাতিক হার কমতে থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন মঞ্চে বাঙ্গালির প্রতিনিধিত্ব তুলনামূলকভাবে কম এবং আগামীদিনে কমবে বই বাড়বে না। শাসন ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বাঙ্গালির সহায় নয়। ফলে, যত দিন যাবে বাঙ্গালি পরিচয়ের সমস্ত কিছু একে একে দখল হয়ে যাবে এবং বাঙ্গালি ধীরে ধীরে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর হতে থাকবে। তারপর একসময়ে বিলীন হতে আর বেশি সময় লাগবে না। □

আত্মনির্ভর ভারতের জীবন্ত উদাহরণ বীর চুড়কা মুর্মু

উনিশশো একাত্তরে পাক-ভারত যুদ্ধে সাবেক পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সদর শহর বালুরঘাটের অনতিদূরে সীমান্ত গ্রাম চকরামপ্রসাদ গ্রামের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শাখার মুখ্যশিক্ষক চুড়কা মুর্মুর

বলিদানের কথা অল্পবিস্তর অনেক মানুষই জানেন। সঙ্ঘের শাখার মাধ্যমে সারা দেশের তথা বিশ্বের নানা প্রান্তে থাকা স্বয়ংসেবকরা গৌরবের সঙ্গে তাঁর আত্মবলিদানের দিনটি স্মরণ করেন। প্রতি বছর ১৮ আগস্ট তাঁর বলিদানের দিনে জেলার স্বয়ংসেবকরা চকরামপ্রসাদ গ্রামে উপস্থিত হয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর সমাধিস্থলে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন এবং গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের বলিদান স্মারক বেদিতে মাল্যদান করে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটি উদ্‌যাপন করেন। এবছর তাঁর আত্মবলিদানের দিনটি এক বিশেষ মাত্রা পায়। স্বস্তিকা পত্রিকার স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট ‘ বীর চুড়কা মুর্মু ও বনবাসী সমাজ’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। ১৫ আগস্ট স্বস্তিকা দপ্তরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পর পুস্তিকাটির উন্মোচন করেন স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য। ওইদিন কল্যাণ আশ্রমের সদর কার্যালয় কল্যাণ ভবনেও বইটি উন্মোচন করা হয়। ১৬ আগস্ট মালদা শহরে বিশিষ্ট জনদের উপস্থিতিতে পুস্তিকাটি উন্মোচন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকর্তা শ্রীসুনীলপদ গোস্বামী। ১৭ আগস্ট বালুরঘাট শহরের সরস্বতী শিশুমন্দিরে এক মনোজ্ঞ ঘরোয়া অনুষ্ঠানে পুস্তিকাটি উন্মোচন করে বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক দুলাল বর্মন ও উত্তমাশা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমিত দাস। তারপরই ‘ চুড়কা মুর্মু ঃ আ ফরগটন হিরো’ শিরোনামে ২৬ মিনিটের স্বল্প দৈর্ঘ্যের একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্রে প্রযোজক তথা নির্দেশক জগন্নাথ বিশ্বাস স্বয়ংসেবক চুড়কা মুর্মু এবং ১৯৭১ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে জওয়ানদের সহযোগিতা করতে গিয়ে কীভাবে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তা প্রাঞ্জলভাবে উপস্থপনা করেছেন। অনুষ্ঠানে প্রযোজক, নির্দেশক ও অভিনেতাদের অভিনন্দিত ও সম্মানিত করেন সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত, জেলা সঙ্ঘচালক অরুণ কুমার মহন্ত, বীর চুড়কা মুর্মু স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি বিনয় কুমার বর্মন প্রমুখ।

১৮ আগস্ট চকরামপ্রসাদ গ্রামে বীর চুড়কা মুর্মু স্মরণ উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। তার আগে চুড়কা মুর্মু বলিদান স্মারক বেদিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অদ্বৈতচরণ দত্ত ও অন্যান্যরা। তারপরে তাঁর সমাধিস্থলে চুড়কা মুর্মুর পরিবার-সহ গ্রামবাসী ও উপস্থিত স্বয়ংসেবকরা পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করেন। সকলের সামনে গ্রামেরই শিক্ষিত যুবক সুবিমল হেমরম সাঁওতালি ভাষায় চুড়কা মুর্মুর স্বয়ংসেবক জীবন, তাঁর সমাজসেবা, দেশভক্তি, আত্মনির্ভর গ্রাম নির্মাণ এবং একাত্তরের যুদ্ধে ভারতীয় জওয়ানেদের সহযোগিতা করতে গিয়ে প্রাণ বলিদানের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করেন। শ্রীহেমরম বলেন, সেই সময় এই বনবাসী অধ্যুষিত গ্রামে পানীয় জলের খুবই অভাব ছিল। জলকষ্ট দূর করতে চুড়কা মুর্মু গ্রামের লোকেদের সঙ্গে নিয়ে কুপ খনন করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আজকের আত্মনির্ভর ভারতের কল্পনা ৭১ সালেই চুড়কা মুর্মু রূপায়ণ করে দেখিয়েছেন। তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, আমার পুত্রকে আমি চুড়কার আদর্শে তৈরি করতে চাই।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চকরামপ্রসাদ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা মামনি বর্মন। তিনি জানান, বালুরঘটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার তাঁর এমপি ফান্ডের টাকায় গ্রামে পাকা রাস্তা, সৌরবিদ্যুতের আলো এবং সমস্ত বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু রাজনৈতিক টানাপোড়েনে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর অনেকেই পাননি।

শেষে চুড়কা মুর্মুর ভাইপো পরেশ মুর্মু তাঁর বাড়িতে সবাইকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। চুড়কার নাতি প্রদেশ ও পলাশ মুর্মু সবার হতে চায়ের কাপ ধরিয়ে দিচ্ছিল। এতগুলি মানুষকে একসঙ্গে তাদের বাড়িতে দেখে স্বভাবতই তারা খুব খুশি।

উপস্থিত ছিলেন গ্রামের অভিজিৎ দেবনাথ, বিপ্লব দেবনাথ। উল্লেখ্য, চুড়কা মুর্মু বলিদান দিবস উপলক্ষ্যে মালদা জেলার ধর্ম জাগরণ সমিতির উদ্যোগে শহরের উপকণ্ঠে গোপালপুর গ্রামে ১৫০ জন বনবাসী ছাত্র-ছাত্রীকে জামাকাপড় ও বই-খাতা-কলম দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা ধর্ম জাগরণ সমিতির গণেশ সরেন, গঙ্গাপ্রসাদ মুর্মু, মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক সুভাষ কুমার দাস প্রমুখ। □

মহান শিক্ষক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

জবা পাল

পাঁচ সেপ্টেম্বর দিনটি বিশ্ববন্দিত মহান শিক্ষক ও দার্শনিক, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন। এই মহান দার্শনিক-শিক্ষককে আজ সমগ্র দেশবাসী গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

রাধাকৃষ্ণনের জন্ম হয় ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর মাদ্রাজের নিকটবর্তী তিরুতানি নামে এক ছোট্ট শহরে। যে পরিবারে তাঁর জন্ম হয়, সেটি ছিল এক সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত গোঁড়া তেলুগু ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁর পিতার নাম সর্বপল্লী বীরস্বামী এবং মাতার নাম সর্বপল্লী সীতাম্মা। পিতা ছিলেন স্থানীয় এক জমিদারের অধীনে রাজস্ব কর্মচারী। সংসারে অভাব-অনটন ছিল। পুত্রের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি বীরস্বামীর নজর থাকলেও তিনি চেয়েছিলেন পুত্র যেন জীবনে একজন খাঁটি পুরোহিত হতে পারে। কিন্তু পড়াশোনার প্রতি রাধাকৃষ্ণনের ছিল গভীর অনুরাগ। এই অনুরাগই তাঁকে সংসারের যাবতীয় অভাব অনটনকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। শৈশব থেকেই রাধাকৃষ্ণন ছিলেন শান্ত প্রকৃতির ও ধর্মমনোভাবাপন্ন। বস্তুত রাধাকৃষ্ণনের পরিবারের ঐতিহ্যগত ধর্মীয় পরিমণ্ডলই তাঁর ভাবী জীবনের বুনিয়াদ গড়ে দিয়েছিল। ১৯০৪ সালে দর্শনে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজে। এই কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে বিএ পাশ করেন এবং ১৯০৮ সালে দর্শনে অনার্স-সহ এমএ পাশ করেন। মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজে অধ্যয়নকালে রাধাকৃষ্ণন অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসেন যাদের প্রভাব তাঁর উত্তর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এমএ পাশ করার পর 'The Ethics of the Vedanta and its Metaphysical Presuppositions'— নামে এক প্রবন্ধ লেখেন যা জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে শুরু হয় রাধাকৃষ্ণনের কর্মজীবন। কর্মজীবনের শুরুতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি যোগদান করেন অধ্যাপকরূপে। তারপর ১৯১৭ সালে চলে যান রাজামুন্দ্রী গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে। তার পরের বছরই অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্টিটিউয়েন্ট কলেজে। ১৯২১ সাল তাঁর কর্মজীবনে এল এক সুবর্ণ সুযোগ। তিনি ডাক পেলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এক রতনের আরেক রতনকে চিনতে দেরি হয়নি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রাধাকৃষ্ণনকে উচ্চতর গবেষণার যাবতীয় সুযোগসুবিধা প্রদানের আশ্বাস দিলে রাধাকৃষ্ণন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজা পঞ্চম জর্জের নামাঙ্কিত চেয়ারে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। এই কলেজে কর্মরত অবস্থায় তিনি ১৯২৬ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে এবং আমেরিকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক দর্শন সম্মেলনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। তারপর ১৯২৯ সালে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন অক্সফোর্ডের ম্যাঞ্চেস্টার কলেজে। এবার ডাক পেলেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৩১-১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য হিসেবে খুব সুনামের সঙ্গে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে রাধাকৃষ্ণন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং নিয়মিত অধ্যাপক হিসেবে বৃত হন। তারপর চলে যান বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সেখানে ১৯৪১ সালে সাম্মানিক উপাচার্য পদে বৃত হন। তিন বছর পর ১৯৪৪ সালে তিনি বিশেষ আমন্ত্রণে চীন সফর করেন। এই সফরকালে তিনি চীনের বিভিন্ন স্থানে অনেক জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন যা উত্তরকালে 'ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

রাজনৈতিক জীবন বলতে সচরাচর আমরা যা বুঝে থাকি, সে অর্থে রাধাকৃষ্ণনের কোনও রাজনৈতিক জীবন ছিল না। জীবনে কোনোদিন তিনি প্রত্যক্ষভাবে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। এমনকী কংগ্রেস দলের সঙ্গেও নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর অংশগ্রহণের কোনও ইতিহাস নেই। তাঁর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন এত উজ্জ্বল ও দ্যুতিময় ছিল, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ছিল যে তিনি রাজনীতি না করলেও রাজনীতি তাঁকে নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিল। বস্তুত তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি স্বাধীন ভারতে তাঁকে রাজনীতির অঙ্গনে আমন্ত্রণ জানায়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রদূত করে রাশিয়ায় পাঠায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবন সেই থেকে শুরু। অবশ্য তার আগে ১৯৪৬ সালে তিনি ইউএনইএসসিও-এর ভারতীয় প্রতিনিধি হয়ে প্যারিসে গিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালে রাধাকৃষ্ণনের জীবনে একটি স্মরণীয় বছর। ওই বছরে তিনি ভারতের তো বটেই, বিশ্বের মধ্যে একজন মহান দার্শনিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। আরও ঘটনা হলো, ওই বছরের ১৩ মে তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতিরূপে বৃত হন। ১৯৫৪ সালে লাভ করেন ভারতরত্ন উপাধি। তারপর ১৯৫৭ সালে আবার উপরাষ্ট্রপতি হন এবং উপরাষ্ট্রপতিরূপে দীর্ঘ দশ বছর কাটানোর পর ১৯৬২ সালে বৃত হন রাষ্ট্রপতির আসনে। বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। এ এক বিরলতম ঘটনা। ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর ১৯৬৩ সালে তিনি লাভ করেন ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ সম্মান 'Order of Merit'। এর আগে ১৯৩১ সালেই তিনি লাভ করেন Knight

উপাধি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে পাঁচ বছর অতিক্রম করার পর ১৯৬৭ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি একজন দার্শনিক রূপে। জীবনের নানা পর্যায়ে তিনি তার এই দার্শনিকতার ছাপ রেখে গেছেন। তিনি চেয়েছিলেন প্রতিটি মানুষ যেন নৈতিক ও আত্মিক উন্নতির সোপান বেয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠে। তাহলেই আমাদের সমাজ হবে আদর্শ মানব সমাজ। তাঁর দৃষ্টিতে পূর্ণ মানবই হলো আদর্শ মানব। সকল মানুষের মধ্যে যাতে একটি বিশ্বদৃষ্টি তৈরি হয়, এটাই ছিল তাঁর জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, শ্রেষ্ঠ বার্তা। তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রতিটি মানুষ অনন্ত শক্তির আধার, বিশ্ব চৈতন্যের অঙ্গ। মানুষের মধ্যে যত বিভিন্নতাই থাকুক না কেন, আসলে তাদের লক্ষ্য এক এবং তা হলো এক বিশ্বজনীন ভাবনা। তাঁর দর্শনের মূল সুরই হলো এক চরম ঐক্যবোধ। এই ঐক্যবোধের কথাই জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর দর্শন চিন্তায় ফুটে উঠেছে। তাঁর দর্শন ভাবনার মূলকথা তাঁর 'My Search for Truth' এবং 'An Idealist view of Life' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

স্মরণাতীতকাল থেকেই ভারত সর্বসমাবেশক সংস্কৃতির দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য— এটাই হলো ভারতের আত্মার বাণী। রাধাকৃষ্ণনের জীবন-দর্শন এই বাণীর ধারক ও বাহক। তিনি মনে করতেন, বাইরের বৈচিত্র্য যেন আমাদের অন্তরের ঐক্যকে কখনও বিঘ্নিত না করে। এই আন্তর ঐক্যের নীরব বাণীই তাঁর জীবন দর্শনে বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ভারত বেদ-উপনিষদের দেশ। অন্যান্য ভারতীয় মনীষীদের মতো রাধাকৃষ্ণনের জীবন-দর্শনও এই বেদ-উপনিষদের দ্বারা সমৃদ্ধ ও অনুপ্রাণিত। তাঁর শিক্ষাদর্শনও তাই। শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন— 'শিক্ষার লক্ষ্য হলো ব্যক্তির মুক্তির সাধনা। শিক্ষাই মানুষকে মুক্ত বা স্বাধীন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।' এই মুক্তি সাধনার মহান যজ্ঞের পুরোহিত হলেন বিশাল শিক্ষক সমাজ। তিনি মনে করতেন, জীবন-সাধনার মর্মকথা নতুন প্রজন্মের মনে পৌঁছে দিতে পারেন একমাত্র নিবেদিতপ্রাণ শ্রেষ্ঠ সাধনায় তাঁরই প্রাণিত করতে পারেন। তাই দেখি, জীবনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করলেও তিনি মনেপ্রাণে ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক।

রাধাকৃষ্ণনের জীবনদর্শনকে যেসব মনীষী উদ্বুদ্ধ ও প্রাণিত করে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মহাত্মা গান্ধী। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর জীবনে ছিল অপরিসীম। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের দর্শন-চিন্তা তাঁকে এতটা বিমোহিত করেছিল যে তিনি তার উপর অনেক প্রবন্ধ লিখে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। এগুলিই পরবর্তী সময়ে 'Philosophy of Rabindranath Tagore' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিবেকানন্দের জীবনদর্শনও তাঁকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। বিবেকানন্দের মানবপ্রেম, মানবসেবা, ধর্মের সর্বজনীনতাকে তিনি জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। তাঁর 'Our Heritage' গ্রন্থখানিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর বিয়ে হয় ১৯০৪ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৬ বছর। তাঁর স্ত্রীর নাম সর্বপল্লী শিবাকাম। রাধাকৃষ্ণন আর মাত্র ৮ বছর বেঁচেছিলেন। অবসর জীবনে গিয়ে তিনি পরিজন ও গুণমুগ্ধদের সঙ্গে মাদ্রাজের নিজ বাসভূমিতেই জীবনের বাকি দিন কাটিয়েছেন। এ সময় তিনি নতুনভাবে লেখালেখির কাজে জড়িয়ে পড়েন যার ফলশ্রুতিতে আমরা ১৯৬৮ সালে তাঁর Religion. Science and Culture' বইটি প্রকাশিত হতে দেখি। মৃত্যুর আগে তিনি ইউরিমিয় রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। মৃত্যুর তিন-চার মাস আগে তিনি Templetion পুরস্কারে ভূষিত হন। এই পুরস্কারের সমুদয় অর্থ তিনি Oxford University-কে দান করে যান। তিনি একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, রাষ্ট্রপ্রধান— আরও কত কী! কিন্তু সব পরিচয়কে ছাপিয়ে যে পরিচয়টি অভ্রভেদী হিমালয়ের মতো মাথা উঁচু করে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তা হলো তিনি ছিলেন আপাদমস্তক একজন মহান শিক্ষক। 'শিক্ষক'— এই নামটির মাঝেই তিনি বাঁচতে চেয়েছেন। সেজন্যই দেখি, ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার পর তাঁর কিছু গুণগ্রাহী যখন তাঁর জন্মদিনটিকে পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, তখন তিনি তাদের বলেছিলেন— আলাদাভাবে আমার জন্মদিন পালন না করে যদি 'শিক্ষক দিবস' রূপে পালন করা হয়, তাহলে আমি খুশি হবো। এ থেকেই বোঝা যায়, তিনি মনেপ্রাণে কতবড়ো একজন নিবেদিতাপ্রাণ শিক্ষক ছিলেন। সেজন্যই তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন— 'He has served his Country in Many Capacities. But above all, he in a great teacher from whom all of us have learnt much and will continue to learn.'

রাধাকৃষ্ণনের ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও উন্নত মনন শক্তির পরিচয় পেয়ে স্বয়ং স্ট্যালিন এত অভিভূত হয়েছিলেন যে, রাধাকৃষ্ণনকে তিনি মাঝেমধ্যে নিছক আলাপচারিতার জন্য ডেকে পাঠাতেন। যেদিন ভারত সরকারের নির্দেশে রাধাকৃষ্ণন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভারতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, সেদিন স্ট্যালিন খুব বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল রাশিয়ায় যেন রাধাকৃষ্ণন আরও কিছুদিন থেকে যান।

রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, Teachers should be the best minds in the Country.' আজ শিক্ষক-দিবসে রাধাকৃষ্ণনের এই উক্তিকে বড়ো বেশি মনে পড়ে। আজ নিজেকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, শিক্ষকতাকে তো আমরা বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি সত্য, কিন্তু ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছি ক'জন? আমরা কি রাধাকৃষ্ণনের কথা অনুযায়ী দেশের মধ্যে 'Best minds' হতে পেরেছি? অবশ্যই পারিনি। এই অপরাধ আমাদের। আমাদের একের সঙ্গে অপরের শিক্ষাগত বা গুণগত তারতম্য থাকবেই। থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্তব্যপালনে মানসিকতার দীনতা থাকবে কেন? কেন সদিচ্ছার অভাব থাকবে? আমরা আমাদের সীমিত শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে যদি কর্তব্য পালনে নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারি, তাহলেই তো যথেষ্ট। শিক্ষাদপ্তর দেখবে শিক্ষক সমাজকে। শিক্ষক সমাজ দেখবে ছাত্র সমাজকে, তাহলেই তো সমস্যা মিটে যায়।

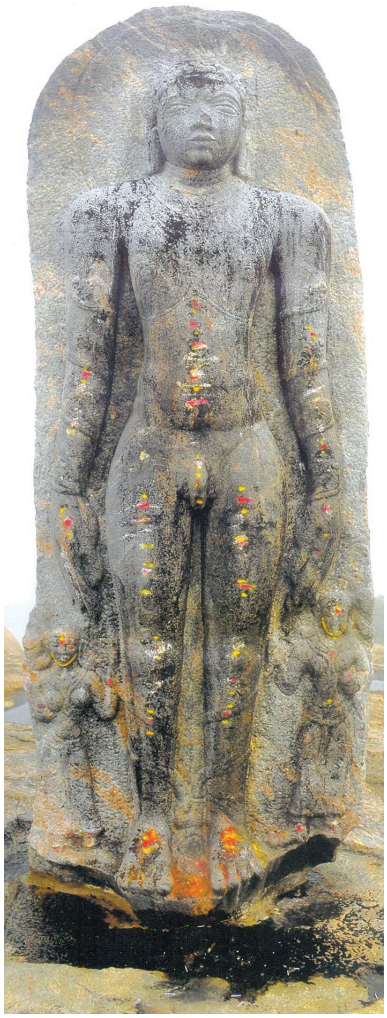

জৈন সংস্কৃতির নতুন খোঁজ

কৌশিক রায়

জৈন ধর্মমতের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীরের আবির্ভাব এবং তিরোভাবের সঙ্গে বিহার রাজ্যের দুটি অঞ্চল জড়িয়ে আছে— মজফ্‌ফরপুর (বৈশালী)-এর কুন্দগ্রাম। মহাবীরের অন্যতম পূর্বসূরি ২৪ জন 'তীর্থংকর'দের মধ্যে অন্যতম বাহুবলীর সুবিশাল গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি মূর্তিটি আছে কর্ণাটকের শ্রবণবেলগোলাতে যেখানে প্রায়োপবেশনে (মৃত্যু পর্যন্ত উপবাস) দেহত্যাগ করেছিলেন জৈন ধর্মে আশ্রয় নেওয়া সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। এই শ্রবণবেলগোলারও নিকটবর্তী মান্দিয়া তালুকের অন্তর্গত মাদ্দুরের কাছে অবস্থিত আরাতিপুরা নামক স্থানটির বিভিন্ন এলাকা থেকে সম্প্রতি ভারতের পুরাতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর উদ্যোগে উৎখননকার্য চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে জৈন ধর্মসংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বেশ কিছু মূর্তি। প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্পের ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে জানতে এই মূর্তিগুলির ভূমিকা, অবশ্যই অপরিহার্য বলে মনে করছেন ইতিহাসবিদরা।

সাধারণত, গঙ্গা ও হোয়সল বংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরাতিপুরে জৈনধর্ম ও ভাস্কর্যের অন্যতম কেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। প্রাচীন জৈন লিপিতে আরাতিপুরাকে উল্লেখ করা হয়েছে তিপ্পুর নামে। এর ৫ কিলোমিটার দূরে আছে কোক্কারাবেল্লুরের বিখ্যাত পক্ষী অভায়ারণ্য। ১৭.৮৩ মিটার উঁচু, গোমতেশ্বর-বাহুবলীর সুবিখ্যাত মূর্তি থেকে এই আরাতিপুরার দূরত্ব ৮৭ কিলোমিটার। আরাতিপুরাতেই পাওয়া গেছে দু'দিকে লতাকুঞ্জের খোদাই ভাস্কর্য বিশিষ্ট বাহুবলীর ২.২ মিটার লম্বা মূর্তি। ২৭০টি সিঁড়ির ধাপযুক্ত বেদীর ওপর স্থাপিত এই মূর্তিটি। সম্ভবত, মাত্র একটি পাথর খোদাই করে শ্রবণবেলগোলাতে স্থাপিত গোমতেশ্বরের বিখ্যাত মূর্তিটির থেকেও প্রাচীন এই বাহুবলীর মূর্তিটি।

আরাতিপুরার চারদিকে প্রায় ২৫১ একর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট এলাকাতে উৎখনন কার্য চালিয়েছে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। এই এলাকার অন্তর্গত দুটি পাহাড়— শ্রাবণবেত্তা (দোদাবেত্তা) ও কনকগিরি (চিক্কাবেত্তা) থেকে আরও বেশ কয়েকটি জৈন মূর্তি ও প্রত্ন নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই এলাকাতে ৪টি উপাসনাগৃহ ঘিরে যে একটি সুপরিকল্পিত জৈন নগরী গড়ে উঠেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখান থেকে যে থামগুলির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে, সেগুলির সঙ্গে প্রাচীন গ্রিক বা হেলেনিক স্থাপত্যের অন্তর্গত দোরিয়ান, কোরিন্থিয়ান ও আইওনিয়ান ঘরানার স্তম্ভের সাদৃশ্য দেখা যায়। থাম ও মন্দিরগুলির বেশিরভাগই গ্র্যানাইট ও বেলেপাথর (স্যান্ডস্টোন) দিয়ে বানানো হয়েছে। আশেপাশের পাহাড় ও টিলা থেকেই এই পাথরগুলি সংগ্রহ করা হয়েছিল। আরাতিপুরা থেকে একটি পাথর পাওয়া গেছে, যার উপরে ২৪ জন তীর্থংকরের মূর্তি খোদাই করা আছে। এখানে বৃষ্টির জল জমা করে পরবর্তীকালে পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য একটি পাথর খোদাই করা জলাধারও পাওয়া গেছে।

কনকগিরি পাহাড়ে একটি সম্পূর্ণ মন্দিরের গর্ভগৃহ বা প্রধান উপাসনাকক্ষের অটুট অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। এখানে এক জৈন দেবী— চক্রেশ্বরী ও তাঁর সঙ্গিনীদের মূর্তি আছে। কয়েকজন তীর্থংকরের মস্তকবিহীন মূর্তিও পাওয়া গেছে এই উৎখনন ক্ষেত্রটি থেকে। বাহুবলী-গোমতেশ্বরের বেদীমূলে যে প্রাচীন নিষাদী বা কন্নড় ভাষার লিপি খোদাই করা আছে (গুণভূষিতানা নিষাদী শাসন) সেই ধরনের লিপিই পাওয়া গেছে আরাতিপুরার বিভিন্ন শিলালিপিতে। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে— আনুমানিক ৬০০ থেকে ৮০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বেঙ্গালুরু, মাল্লোহাল্লি ও আরাদিপুরাতে এই ধরনের স্থাপত্য ও জৈন প্রবচনমূলক লিপি চালু করেন রাজা দ্বিতীয় শিবরামের পুত্র— রাজকুমার নরসিম্‌হা ইরাইয়াপ্পা। তিনি পোন্নাতি নামক জনৈক জৈন ধর্মাচার্যকে 'তিপ্পের' নামক গ্রামটিকে দানও করেন। হোয়াসল রাজারাও আরাতিপুরাতে জৈনধর্মের

প্রচারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তবে, পরবর্তীকালে তাঁরা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখনই বীতশ্রদ্ধ জৈন শ্রমণরা, আরাতিপুরা পরিত্যাগ করেন। তাঁরা শ্রবণবেলগোলাতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। তবে, কদম্ব ও চালুক্য বংশের সম্রাটরাও আরাতিপুরাতে জৈন উপাসনালয় বা 'দারেসার'- গুলিকে উন্নত করতে আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য হলেন— পুষ্যভূতিরাজ হর্ষবর্ধনকে পরাস্তকারী চালুক্য নৃপতি দ্বিতীয় পুলকেশী।

গোমতেশ্বর বাহুবলীর বিশালকায় সৌম্য মূর্তিটি দেখতে যাওয়ার পথে চোখে পড়বে ত্রিকূট পাহাড়ে অবস্থিত ওদেগাল জৈন উপাসনালয় বা 'বাসাদি'। অন্যতম তীর্থংকর ও মহাবীর বর্ধমানের পূর্বসূরি পার্শ্বনাথ (পরেশনাথ)-এর তপস্যাস্থল— ভদ্রবাহু গুহাটিও যেন অন্তরের গভীরতম স্থানে এক প্রশান্ত, সর্বব্যাপী অধ্যাত্মচেতনা জাগিয়ে তোলে। চন্দ্রগিরি পাহাড়ে আছে আরেকটি নিভৃত ও স্থাপত্যশিল্পে সমুজ্জ্বল— চাভুন্দারায়া বাসাদি। অখণ্ডবাগিলু মন্দিরে পদ্মাসনে উপবিষ্টা গজলক্ষ্মী দেবীর বিশাল মূর্তিটিও দেখার মতো। এই মূর্তিটির চারপাশে ২৪ জন জৈন তীর্থংকরের মূর্তিযুক্ত কক্ষ আছে। এই মূর্তির নিকটবর্তী অঞ্চলে দেখা যায় চতুর্দশ ও সপ্তদশ শতকে নির্মিত 'চেন্নানা বাসাদি' ও 'সিদ্দারা বাসাদি' নামক দুটি জৈন তীর্থস্থান। অন্যতম জৈন তীর্থংকর আদিনাথের মূর্তিটি একটি কালো গ্র্যানাইট পাথর খোদাই করে বানানো হয়েছে। এছাড়াও আরও দুই জৈন তীর্থংকর নেমিনাথ ও শান্তিনাথেরও মূর্তি শোভা পাচ্ছে এখানে।

নিকটবর্তী চন্দ্রগিরি পাহাড়টি নামকরণ হয়েছে জীবনের শেষ পর্যায়ে এখানে আশ্রয় নেওয়া, জৈন ধর্মাবলম্বী সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের নাম থেকে। এখানকার মন্দিরগুলি সপ্তম থেকে দশম খ্রিস্টীয় শতকের মধ্যে নির্মিত। এগুলির মধ্যে সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, কাত্তালে, মাজ্জিগণ, এরুদাক্কাতে, শান্তিশ্বর ও ব্রহ্মাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত দেউলগুলি উল্লেখযোগ্য। ১১৮১ সালে 'আক্কানা বাসাদি' নামক মন্দিরটি নির্মাণ করেন হোয়সল নৃপতি— দ্বিতীয় বল্লালের মন্ত্রী আচিইয়াক্কার ধর্মপ্রাণা পত্নী চন্দ্রামৌলি।

শ্রবণবেলগোলার কেন্দ্রস্থলে আছে সবচেয়ে বড়ো জৈন উপাসনাময়— ভাণ্ডারা বাসাদি। একটি বড়ো দীঘির কাছে (বেলগোলা শব্দটির অর্থ— সাদা দীঘি) অবস্থিত এই মন্দিরটি। দুধ দিয়ে বাহুবলীর মহামস্তকাভিষেকের জন্যই দীঘিটির এই নাম। সম্ভবত ১১০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে হোয়সাল রাজা নরসিম্হার অর্থমন্ত্রী (মতান্তরে প্রধান সেনাপতি)— ভাণ্ডারী হুল্লাম্মাইয়ার দ্বারা মন্দিরটি নির্মিত হয়। প্রায় ৩৮ মিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে মন্দিরটি। মন্দিরটি জৈন তীর্থংকরদের মূর্তি ছাড়াও দেবরাজ ইন্দ্রের একটি নয়নাভিরাম পাথরের মূর্তি আছে। প্রতি বছর মন্দিরটিতে 'পঞ্চকল্যাণ' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও শ্রবণবেলগোলা থেকে অনতিদূরে জীনাজ্জাপুরা অঞ্চলে অবস্থিত আরেগাল বাসাদি মন্দিরে আছে সাদা মর্মর পাথরে তৈরি তীর্থংকর পরেশনাথের অনুপম যোগমুদ্রাতে উপবিষ্ট মূর্তি। তীর্থংকর শান্তিনাথের মন্দিরটির নির্মাণ করিয়েছিলেন রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সেনাপ্রধান ও অমাত্য-রাক্কান্না। একটি ১ মিটার উঁচু বেদি বা জাগাতির ওপর অবস্থিত এই মন্দিরটি। পাথরের দেওয়ালগাত্রে অসাধারণ খোদাই মূর্তিগুলি কোনারকের সূর্য মন্দির, হ্যালেবিদের চেন্নাকেশ্বরের মন্দির, মদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দির ও মহাবলীপুরমের মন্দিরের অনুপম ভাস্কর্য-কাব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। মন্দিরটিতে আছে গ্র্যানাইট পাথরের তৈরি তীর্থংকর শান্তিনাথের ধ্যানমগ্ন মূর্তি। এছাড়াও যক্ষ, কিন্নরী, দ্বারপাল, মোহিনী, কিন্নর-কিন্নরীদের বিভিন্ন ভঙ্গিমারত মূর্তিতে শোভিত এই মন্দিরটি শ্রবণবেলগোলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কাম্বদাহাহাল্লি অঞ্চলে আছে আরেকটি সুপ্রসিদ্ধ জৈন মন্দির— 'পঞ্চকূট বাসাদি'। গোঙ্গা রাজবংশের আমলে দশম খ্রিস্টীয় শতকে দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরীতি অনুযায়ী মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটি তীর্থংকর নেমিনাথ, আদিনাথ বা ঋষভনাথ ও শান্তিনাথের জন্য পৃথক উপাসনাগৃহ আছে। জাক্কালাম্বা বাসাদির জৈন মন্দিরটি একটি দীঘি সমতে নির্মিত হয়েছিল খরার প্রকোপ থেকে সাধারণ মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য। মন্দিরটিতে নেমিনাথ ও দুই বৃষ্টিদায়ক যক্ষ-যক্ষী-কুশমন্দিনী দেবী ও গোমেতের মূর্তি আছে।

বর্তমানে অবলুপ্ত, প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের মধ্যে অন্যতম— রোজস দ্বীপের প্রবেশদ্বার নির্মিত দেবতা আপল্লনের মূর্তি বা 'কোলোসাম'-এর মতোই আকাশচুম্বী গোমতেশ্বরের মূর্তি। তাকে ঘিরে অনামা শিল্পীদের ছেনি-হাতুড়ি-বাটালির অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছে এই জৈন মন্দির বা 'বাসাদি'গুলি। জৈন তীর্থংকরর আজীবন এই সাধারণ শ্রমজীবী মানুষদের মোক্ষলাভ ও সার্বিক কল্যাণের উপায়ই চিন্তা করে গেছেন। মহাবীরের পুণ্য সান্নিধ্যেই মগধ-নৃপতি বিম্বিসার হয়ে উঠেছিলেন প্রজারঞ্জক। আজ যখন অতিমারীর নিষ্ঠুর মারণাঘাতে পরিযায়ী শ্রমিকরা নিরন্ন, নিরাশ্রয়, নিঃসহায়, তখন ওই জৈন দেউলগুলির অজস্র, অজ্ঞাতনামা নির্মাতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে কবিগুরুর কথারই প্রতিধ্বনি করতে হয়—

'ওরা কাজ করে, নগরে প্রান্তরে
....
দুঃখ-সুখ-দিবসরজনী,
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের
মহামন্ত্রধ্বনি
....
শতশত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে
ওরা কাজ করে।'

শুধুমাত্র বিজেপিকে আটকাতে গিয়ে তলিয়ে গেছে অনেক দল

দুর্গাপদ ঘোষ

বাস্তব উপলব্ধির নিরিখে এদেশের বাম নেতাদের মুখ থেকে মাঝে মাঝে কিছু সত্যি কথা বেফাঁস হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সম্পূর্ণ ভরাডুবির কারণ বিশ্লেষণ করতে বসে তাঁরা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে কেবল 'বিজেপি ঠেকানোর' নীতির কারণে তাঁদের আজ এই দশা হয়েছে। বিমান বসু, সুজন চক্রবর্তী, সূর্যকান্ত মিশ্র প্রমুখ বাম নেতাদের এই মূল্যায়ন একান্ত বাস্তব। রাজ্য বিধানসভায় ২০১৬ সালে পাওয়া বামফ্রন্টের ৩২ আসন থেকে এবারে একেবারে শূন্যে নেমে যাওয়ার অন্যান্য কারণ যে নেই তা নয়। কিন্তু এটাই যে গত ২-৩ দশকে তাঁদের ক্রমাগত তলানির দিকে নিয়ে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে এক সময় জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 'বিজেপি? এ রাজ্যে বিজেপি আবার কোথায়?' তারপর থেকে বাম নেতারা সব সময় সেই বিজেপি-তেই চোখে সর্ষের ফুল দেখে এসেছেন। আজ তাঁদের চোখের সামনেই বিধানসভায় বিজেপি ৭৭টা আসন নিয়ে বিরোধী বেঞ্চ আলো করে বসে আছে। গতবারের চাইতে ৭৪টা আসন বেশি জিতে নিয়েছে। কেবল বামেরাই নয়, শুধুমাত্র বিজেপিকে ঠেকাতে গিয়ে, আরও বেশি স্পষ্ট করে বলতে গেলে হিন্দু ভোটারদের একতাবদ্ধ হওয়া ঠেকাতে গিয়ে আরও অনেকে দলের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়ে গেছে। অনেক দলনেতাই এটা মর্মে মর্মে মালুম পেলেও বাম নেতাদের যে সেকথা প্রকাশ্যে বলার মতো বোধোদয় হয়েছে তা নিঃসন্দেহে উল্লেখ করার মতো।

ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যাবে মুসলমান ভোট থেকে বঞ্চিত হবার অমূলক আশঙ্কায় অনেক সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক দল প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কেবল এক বগ্গা 'বিজেপি ঠেকাও' কৌশলের জন্য। সেই বিজেপি-কে এখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মুসলমানরা সমর্থন করছেন, বিভিন্ন রাজ্যে এবং

কেন্দ্রে বিজেপির টিকিটে জিতে অনেক মুসলমান নেতা মন্ত্রীপদও অলংকৃত করেছেন এবং করছেন। কংগ্রেসের কূটচালে পা দিয়ে বিজেপির পূর্বতন রূপ ভারতীয় জনসঙ্ঘ-কে ঠেকানোর চেষ্টা চালান উত্তরপ্রদেশের অবিসংবাদী জাঠ-নেতা চৌধুরী চরণ সিংহ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তাঁরও প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার স্বপ্ন ছিল। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর বলবত করা অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে প্রথম যে অ-কংগ্রেসি সরকার গঠিত হয়েছিল তা নামে জনতা পার্টির সরকার হলেও বাস্তবে ছিল জোট সরকার। সেবার লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস বিরোধীদের মধ্যে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ৩ জন সমর্থিত নির্দলসহ সবচাইতে বেশি মোট ৯৭ আসনে জিতেছিল। জোট রাজনীতির ধর্ম অনুসারে সেবারই প্রধানমন্ত্রী হবার কথা ছিল জনসঙ্ঘের অটলবিহারী বাজপেয়ীর। কিন্তু যে কোনো উপায়ে মসনদে বসার বাসনা, আকাঙ্ক্ষা বা নীতি কোনোটাই বাজপেয়ী-সহ জনসঙ্ঘের নেতাদের ছিল না। সেবার কংগ্রেসের মূল অংশ আদি কংগ্রেসের দখলে এসেছিল মাত্র ১৪টা আসন। কিন্তু পূর্বতন ইন্দিরা সরকারে উপপ্রধানমন্ত্রী থাকায় মোরারজী দেশাইকে সামনে রেখে সুষ্ঠ ও সুস্থ সরকার চালনার লক্ষ্যে বাজপেয়ী নিজেই মোরারজীকে প্রধানমন্ত্রী হবার প্রস্তাব দেন। নিজে হন এদেশের প্রথম সফল বিদেশমন্ত্রী। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হন লালকৃষ্ণ আদবানি যাঁর আমলে আকাশবাণী ও দূরদর্শনের মতো সরকারি গণমাধ্যমে সব দলের বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা চালু হয়। তার আগে বেতার বা অল ইন্ডিয়া রেডিয়োকে কটাক্ষ করে বলা হতো 'অল ইন্দিরা রেডিয়ো' এবং দূরদর্শনকে বলা হতো 'ইন্দিরা দর্শন'। জনসঙ্ঘের এই সব জনমুখী নীতির কারণে কংগ্রেসের পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে দেখে ক্ষমতালোভী চরণ সিংহকে প্রধানমন্ত্রী করার টোপ দেয় কংগ্রেস। তিনি তখন ছিলেন মোরারজী সরকারের অন্যতম উপপ্রধানমন্ত্রী। চরণ সিংহও মনে মনে জনসঙ্ঘের উত্থান প্রতিহত করার বাসনা পোষণ করতে থাকেন। সেই সঙ্গে ক্ষমতার রাজভোগে কামড় দেওয়ার লোভে মোরারজীর সরকার ভেঙে বেরিয়ে যান এবং কংগ্রেসের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী হয়েই যারপরনাই সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, 'মেরী স্বপ্না পুরী হো গয়ী'— আমার স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে। তাঁর এই আচরণে সে সময় সাংবাদিকদের একাংশ বিদ্রূপ করে সব সময় খাবারের টুকরো নিয়ে কামড়াকামড়ি করা স্বভাবের মুরগির সঙ্গে তাঁর তুলনা করে বলতেন, 'লেগ হর্ন'। লেগ-চরণ হর্ন— সিংহ। কিন্তু জনসঙ্ঘ ঠেকানোর রাজনীতির ছলে হঠাৎ করে এক রাতে কয়েক রাতের জন্য রাজা বনে গেলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর তৈরি করা রাষ্ট্রীয় লোকদল (আর এল ডি)-এর কপালে গ্রহণ লাগতে দেরি হয়নি। উত্তরপ্রদেশের সেই ডাকসাইটে জাঠনেতা এবং তাঁর ছেলে চৌধুরী অজিত সিংহ একবার এ দল, একবার সে দলের কাছা ধরেও নিজেদের জীবদ্দশায় প্রধানমন্ত্রী তো দূরের কথা, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্বের ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেননি। আর এল ডি-র অবস্থা এখন টিমটিমে লম্ফর মতো।

তবে সারা ভারতবর্ষে বিজেপি ঠেকাতে

ফঃ ৫

গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে প্রথম বিশ্বাসঘাতকতা যদি কেউ করে থাকেন তবে তিনি হলেন কর্ণাটকের প্রথম অকংগ্রেসি জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী রামকৃষ্ণ হেগড়ে। জনতা পার্টির দক্ষিণ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই নেতা দক্ষিণের সবচাইতে জনপ্রিয় নেতা প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী এআইএডিএমকে নেতা এম জি রামচন্দ্রনের প্রায় সমতুল হয়ে উঠছিলেন। বিশেষ করে রামচন্দ্রনের হঠাৎ প্রয়াণের পর হেগড়েই ছিলেন দক্ষিণে বস্তুত অবিসংবাদী অ-কংগ্রেসী নেতা। কিন্তু বিজেপি ঠেকাতে গিয়ে তাঁরও পরিণতি আরও বেশি খারাপ হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে কর্ণাটকে জনসঙ্ঘের সঙ্গে জোট বেঁধে কংগ্রেসকে হারিয়ে জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। সেবার বিজেপি ১৪টা আসন লাভ করে। হেগড়ের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ভালো ছিল। বেশ কিছু জনমুখী নীতি নিয়েছিল সেই জোট সরকার। রাজ্য বিধানসভায় নিয়মিত জনতা দরবার করে জনগণের কথা শুনতেন। তার ফলে পরের বিধানসভা নির্বাচনে ফের বিজেপির সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচন লড়ে আরও ভালো ফল হয়। হেগড়ের দল একাই নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভ করে। বিজেপির আসনও আরও ৩টে বেড়ে হয় ১৭টা। তাতেই চোখে সর্ষের ফুল দেখতে শুরু করেন তিনি। নিবাচনী জোট করে জিতেও বিজেপিকে বাদ দিয়ে তাঁর একার দলের সরকার গড়েন। বিজেপির স্থান হয় বিরোধী পক্ষে। হেগড়ে হাতে নাতে তার বিষফল পেয়ে যান পরের নির্বাচনে। বিজেপির সঙ্গে জোট না হওয়ায় কংগ্রেসের কাছে গো-হারা হেরে সরকার থেকে বিদায় নিতে হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই কর্ণাটকের রাজনীতি থেকে রামকৃষ্ণ হেগড়ে এবং জনতা পার্টির অন্তর্জলি যাত্রা ঘটে। এখন সে রাজ্যে একক ভাবে সরকারে রয়েছে বিজেপি।

আরও একটু পিছনে তাকানো যাক। ১৯৬৭ সালে জনসঙ্ঘ যখন মধ্যপ্রদেশে প্রথম সরকার গড়ে এবং গোয়ালিয়রের রাজপুত্র মাধবরাও সিন্ধিয়া যখন জনসঙ্ঘের টিকিটে প্রথম লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হন তখন যতদূর মনে পড়ে ৬৭টা আসনে জিতে লোকসভায় প্রথম স্বীকৃত বিরোধী দলের মর্যাদা লাভ করে স্বতন্ত্র পার্টি। দলটা গড়ে উঠেছিল মুখ্যত সোশ্যালিস্ট বা সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে। স্বতন্ত্র পার্টির নেতা ছিলেন মিনু মাসানি। জনসঙ্ঘের নেতারা তাঁকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কমিউনিস্ট ও মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে বাকিদের নিয়ে জোট করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করা হোক। কিন্তু মিনু মাসানি তাতে সাড়া দেননি। তাঁর আশঙ্কা ছিল জনসঙ্ঘ তাতে আরও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তখন কমিউনিস্টদের শক্তি বেশ ভালোই ছিল। সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টদের মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শের নৈকট্যও সর্ববিদিত। সেবার মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় জনসঙ্ঘের একজন বিধায়ক ছিলেন ওমপ্রকাশ (ও পি) ত্যাগী। তিনি রাজ্য বিধানসভায় ধর্মান্তরকরণ-বিরোধী একটা বিল এনেছিলেন। সারা দেশে সংখ্যালঘু তোষণকারীরা কোমর বেঁধে সেই বিলের বিরোধিতায় নেমেছিলেন। প্রধান দল কংগ্রেস বাকি দলগুলোকে প্ররোচিত করে জনসঙ্ঘকে কোণঠাসা করে ফেলার চেষ্টা করে। স্বতন্ত্র পার্টি আদতে কট্টর জনসঙ্ঘ বিরোধী ছিল না। কিন্তু ধর্মান্তরকরণ- বিরোধী জনসঙ্ঘের সঙ্গে বা তার কাছাকাছি থাকলে নিজেদের সাজানো সেকুলার ভাবমূর্তি ধাক্কা খেতে পারে, সেই সঙ্গে স্বতন্ত্র পার্টির মতো একটা বড়ো শক্তিকে সঙ্গে পেলে জনসঙ্ঘের বাড়বাড়ন্ত হতে পারে মনে করে স্বতন্ত্র পার্টি তখন জনসঙ্ঘের সে আহ্বানে এগিয়ে আসেনি। মোদ্দা কথাটা হলো, ভারতীয় জনসঙ্ঘকে ঠেকাতে গিয়ে তার পরেরবার স্বতন্ত্র পার্টির গঙ্গাযাত্রা ঘটে। মিনু মাসানি ও তাঁর স্বতন্ত্র দলের নাম এখন কতজন সাধারণ মানুষ জানেন সেটাই মনে হয় রাজনৈতিক গবেষণার বিষয়।

কংগ্রেস, কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা বরাবরই দেশ ভেঙে পাকিস্তান বানিয়ে নেওয়া মুসলিম লিগের দোসর। প্রথম থেকেই তারা জনসঙ্ঘ-বিজেপি বিরোধী। এদের লক্ষ্য যেভাবেই হোক 'বিজেপি ঠেকাও' রাজনীতি। এই লক্ষ্যে এরা এক এক রাজ্যে একে অন্যের মুণ্ডপাত করছে আবার সুবিধা মতো নিজেদের আদর্শ শিকেয় তুলে গলাগলি, জোট বাঁধাবাঁধি করে যাচ্ছে। কোথাও কুস্তি করছে তো কোথাও দোস্তি করছে। কখনো কাউকে জোটসঙ্গী করছে বা সমর্থন দিয়ে সরকারে বসাচ্ছে তো কখনো আমের আঁটির মতো আদাড়ে (নর্দমা) ছুঁড়ে ফেলছে। এজন্য বিজেপির এক সহ-সভাপতি প্রয়াত জগন্নাথরাও যোশী মন্তব্য করেছিলেন যে সমাজতন্ত্রীরা হলেন দর্জির মতো। কাটা ও জোড়া দেওয়াই তাঁদের কাজ। অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মাণকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাচ্যুত কংগ্রেস যখন বিজেপি-ঠেকাতে জনতা পার্টির সর্বশেষ নেতা চন্দ্রশেখরকে সমর্থন করে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসায় তখন চন্দ্রশেখর প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের ভিত্তিতে রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদের পক্ষপাতীদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিবাদ মেটানোর আন্তরিক চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তা যখন প্রায় সমাধানের দোরগোড়ায় পৌঁছে যায় তখন হঠাৎ চন্দ্রশেখর সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতাদের ফোনে আড়ি পাতার অভিযোগ তুলে কংগ্রেস তাঁর সরকারকে ১৯৯১ সালের ২১ জুন ফেলে দেয়। কংগ্রেসের ভয় হয়েছিল বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমাধান হয়ে গেলে এবং মন্দির নির্মাণের পথ পরিষ্কার হয়ে গেলে বিজেপি তাতে সুবিধা পেয়ে যাবে। কেন্দ্রে কেবল চন্দ্রশেখরই নয়, কংগ্রেস আই কে গুজরাল এবং এইচ ডি দেবেগৌড়ার সঙ্গেও একইভাবে সখ্য ও খলতার রাজনীতি করেছে যাতে বিজেপি কোনোভাবেই সুবিধা না করতে পারে। বিভিন্ন রাজ্য যেমন ঝাড়খণ্ড, কর্ণাটক ইত্যাদিতেও শুধু বিজেপিকে ঠেকাতে নীতিহীন রাজনীতির আশ্রয় নিয়েছে। নিকৃষ্টতম উদাহরণ সৃষ্টি করেছে ঝাড়খণ্ডে। বিজেপি-কে আটকাতে একবার সেখানে এক নির্দল সদস্য মধু কোড়াকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়েছে। অন্যদিকে বিজেপির সামনে কংগ্রেস ঠেকানোর নীতি থাকলেও সেজন্য যে কোনো কুনীতি কখনো গ্রহণ করেনি। কারো সঙ্গে জোট করে নিজেদের সুবিধা মতো কাউকে ছেঁটে ফেলেনি কিংবা জোট ভেঙে বেরিয়ে এসে কারো সরকার ভাঙেনি। এ প্রসঙ্গে যদি কেন্দ্রে ভি পি সিংহ সরকারের কথা ওঠে তবে তার দায় সম্পূর্ণভাবেই ভিপি-র তথা তাঁর জনতা দলের। ১৯৭৭ সালে লোকসভায় সবার চাইতে বেশি আসনে জিতেও বাজপেয়ীরা প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি ছেড়ে দিয়েছিলেন মোরারজী ভাইকে। সেই ভুলের মাসুল গুণতে হয়েছে জনতা দলকে। শুধুমাত্র বিজেপি ঠেকাতে গিয়ে জনতা দলটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভি পি সিংহ তাঁর জীবদ্দশায় ফের প্রধানমন্ত্রী তো দূর, মুখ্যমন্ত্রীও হতে পারেননি। এখন জনতা দল বলতে যেটুকু অস্তিত্ব বজায় রয়েছে তা কয়েকটি দলের ভগ্নাংশ মাত্র। অন্যদিকে দেশের উন্নয়নকে আদর্শ করা বিজেপির অবস্থান কোথায় তা সবার সামনেই পরিষ্কার। শুধুমাত্র 'বিজেপি ঠেকাও' নীতি নিতে গিয়ে এক সময়ের সম্ভাবনাময় বড়ো বড়ো দলের এন্তেকাল সম্পন্ন হয়েছে। □

জাতীয় নগদীকরণ পাইপলাইন একটি সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

মানিটাইজেশনের বাংলা নগদীকরণ বা মুদ্রায়ন। কার্যক্ষেত্রে এর অর্থ কোনো সম্পদ বা বস্তুকে মুদ্রা বা লিগ্যাল টেন্ডারে পরিণত করা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এর মানে পৃথক হয়। এটা সেই পদ্ধতি যাতে একটা রাজস্ব আদায় না করা কোনো দ্রব্যকে নগদে পরিবর্তিত করা হয়; নতুন নতুন উৎস থেকে নবতর আয় অর্জনের পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়। যেমন সোশ্যাল মিডিয়ার ভিডিয়ো ক্লিপের মধ্যে রাজস্ব আদায়কারী বিজ্ঞাপন গুঁজে দেওয়া। যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঋণকে মুদ্রায়ন করা হয় নোট, বিল বা বন্ড কিনে।

সরকার ঋণলব্ধ টাকার সুদের হার কম রাখতে মানিটাইজ করে। অর্থনৈতিক সংকট দূর করতেও তারা এটা করতে পারে। আর ব্যবসাদাররা লাভ বাড়ানোর জন্য তাদের পণ্য ও পরিষেবাকে মানিটাইজ বা নগদীকরণ করে।

সমসাময়িককালের পুঁজিবাদের সঙ্গে মুদ্রাকরণ হাতে হাত ধরে চলে। কৌশলগত কারণে ব্যবসা বা অন্য কোনো সংস্থার বৃদ্ধিতে নগদীকরণ পদ্ধতি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে সব কর্মকাণ্ড এমনিতেই আয়-অর্জনকারী নয় বা ব্যয়বহুল তাদের লাভের উৎসে পরিণত করা বর্তমানের সব উদ্যোগের লক্ষ্য এবং সব রকম উদ্যোগপতিরাই সেটাই চায়।

এটা নতুন নয়। রেডিয়ো টিভি বহু দশক ধরে বিজ্ঞাপন থেকে আয় করে খরচ চালিয়েছে। খবরের কাগজ ছাপিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আয় করেছে। তাদের গ্রাহকদের থেকে যা টাকা পায় তাতে কোনো কাগজ চলত না।

সব বিনিয়োগকারী সরকারকে বারংবার একটা স্থির ও জোরদার সম্পদের প্রণালী বা পাইপলাইন তৈরি করতে বলেছেন। তাতে বিনিয়োগকারী ও উন্নয়নকারীরা ব্রাউনফিল্ডে বিনিয়োগ করার উপযুক্ত পথ খুঁজে পায়। এই জাতীয় মুদ্রাকরণ পাইপলাইনের ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলো ভালো সম্পদের কার্যাবলী তদারকি করার জন্য একটা নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী অনুসরণ করবে। এর পরিণতি হচ্ছে এই জাতীয় নগদীকরণ পাইপলাইন।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ও কৌশল হবে দেশের প্রতিটা নাগরিকদের জীবনমান উন্নত করা। পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা এই লক্ষ্যে অভিসূচিত। ন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টের লক্ষ্য ২০২০ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে ১১১ লক্ষ কোটি টাকা পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ করা। বছরে গড়ে ২২ লক্ষ কোটি টাকা। এটা ঐতিহাসিক উন্নয়ন, কারণ পরিকাঠামোয় এত টাকা বিনিয়োগ আগে করা হয়নি। প্রায় ২.৫ গুণ। এই সম্পদ নগদীকরণের মূল লক্ষ্য হলো এযাবৎ অব্যবহৃত বেসরকারি পুঁজি ও দক্ষতা বিনিয়োগ করা, এটাকেই কাজে লাগিয়ে তাদের গ্রিনফিল্ড পরিকাঠামো সৃষ্টি করার কাজে লাগানোর জন্য। এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২০২১-এর মার্চে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর ফিনান্সিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট বিল পাশ করা হয়েছে।

এতে ভারত সরকারের ১০০ শতাংশ শেয়ার থাকবে। তার প্রারম্ভিক শেয়ার মূলধন থাকবে ২০০০০ কোটি টাকা। তিন বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে।

ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন সম্ভাবনাময় ব্রাউনফিল্ড পরিকাঠামো সম্পদের জন্য করা হবে। একটা অ্যাসেট মানিটাইজেশন বা সম্পদ তদারকির ড্যাশবোর্ড থাকবে যাতে প্রগতি লক্ষ্য করা যাবে ও বিনিয়োগকারীরা সব দেখতে পারবেন। ২০২২-২০২২ আর্থিক বছরে বিভিন্ন সম্পদকে নগদীকরণ করা হবে।

অর্থমন্ত্রী জাতীয় নগদীকরণ পাইপলাইন বা ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইন উদ্বোধন করেছেন। এর লক্ষ্য হচ্ছে রেল, সড়ক ও শক্তি উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে চার বছরে ছয় লক্ষ কোটি টাকা তোলা।

১। সম্পদের মালিকানা সরকারের হাতেই থাকবে। নির্ধারিত সময়ের পরে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

২। জমি মুদ্রাকরণ করা হবে না; কেবল ব্রাউনফিল্ড সম্পদ (পুরনো চালু ও সমর্থ সম্পদ) নগদীকরণ করা হবে। পরিকল্পনা মতো বিক্রয়গুলো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কৌশলগত বেসরকারীকরণ নীতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। সেই অনুসারে রাষ্ট্র কেবল কয়েকটি মাত্র চিহ্নিত ক্ষেত্রে তাদের জড়িত রাখবে, বাকিগুলোতে বেসরকারীকরণ হবে।

৩। ২৬৭০০ কিলোমিটার সড়ককে নগদীকরণের আওতায় রাখা হয়েছে সেটা মোট জাতীয় সড়কের মাত্র ২২ শতাংশ।

৪। বিদ্যুৎ পরিবহণ সম্পদ নগদীকরণের জন্য ধরা হয়েছে। যার মূল্য আন্দাজ ৭৭০০ কোটি টাকা।

৫। প্রায় ২.৮৬ লক্ষ রুট-কিলোমিটার ভারতনেট ফাইবার সম্পদ প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপের জন্য নিলাম শুরু করেছে। বিএসএনএল ও এমটিএনএল টাওয়ারগুলোর মানিটাইজেশন হবে ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে।

৬। ন্যাশনাল হাইড্রো পাওয়ার কর্পোরেশন, ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন, শতদ্রু জল বিদ্যুৎ পরিবহণ সম্পদ এবং ন্যাভেলি লিগনাইট কর্পোরেশনের পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ

ব্লক করা হবে।

৭। ২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরে দুটো প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন যার মোট দৈর্ঘ্য ২২২৯ কিলোমিটার এবং যার মধ্যে দাহেজ-উরান-পানভেল-হাসানের ৩৯০০ কিলোমিটার পেট্রোলিয়াম পণ্য বা এলপিজিকে ২০২৩-২০২৪ সালে নগদীকরণ করা হবে। এছাড়া, ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের গুজরাট শোধনাগারের দুটো হাইড্রোজেন উৎপাদন কেন্দ্রকেও ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৯। সরকার ১৬০-এর অধিক প্রকল্পকে প্রাইভেট-সেক্টর অংশগ্রহণের জন্য চিহ্নিত করেছেন। কোল ইন্ডিয়া ১৫টা প্রকল্পে, ন্যাভেলি লিগনাইটের দুটো প্রকল্পে, তার সঙ্গে কোল গ্যাসিফিকেশন প্ল্যান্ট ও খনিগুলোর বাণিজ্যিক নিলাম নগদীকরণের জন্য বিবেচনা করা হবে।

১০। ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে এয়ার ইন্ডিয়া অথরিটির ২৫টা বৃহৎ বিমানবন্দরকে নগদীকরণ করা হবে।

১১। দুটো জাতীয় স্টেডিয়াম ও স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেডের দুটো স্টেডিয়ামকে এই পরিকল্পনার অধীনে নগদীকরণ করা হবে।

১২। ইন্ডিয়ান ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশনের পুরো ৮টা হোটেলকেই ২০২২-২৫ বছরের ভিতরে নগদীকরণ করা হবে বলে ধরা হয়েছে।

১৩। রেলের যে মুখ্য সম্পদগুলোকে ২০২২-২৫ আর্থিক বছরে নগদীকরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে তার মধ্যে আছে ৪০০ রেলওয়ে স্টেশন, ৯টা যাত্রীবাহী ট্রেন, ১৪০০ কিলোমিটার রেলপথের ১টা রুট, কোঙ্কন রেলওয়ের ৭৪১ কিমি, ১৫টা রেলওয়ে স্টেডিয়াম এবং নির্বাচিত রেল কলোনি, রেলওয়ের মালিকানাধীন ২৬৫ টি পণ্য গুদাম ও ৪টে পার্বত্য রেলওয়ে।

বিনিয়োগকারীদের থেকে কাউন্টার পার্টি ঝুঁকি বহন করার মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উত্তর আমেরিকা ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে ইতিমধ্যেই পরিপক্ক পরিকাঠামো প্রকল্পে বিভিন্ন সংস্থার থেকে বিনিয়োগ করা হয়েছে। ঝুঁকিগুলো সরকার ও বেসরকারি সংস্থার মধ্যে সুষম বণ্টন করা হবে। পরিকাঠামো পরিষেবার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ একটা দরদাম স্থির করা হবে।

অনেক পক্ষ যেমন প্রকল্প স্পন্সর, ঋণদাতা, সরকারি দপ্তর ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা জড়িত থাকার ফলে পরিকাঠামোর নগদীকরণ জটিল হতে পারে। এর জন্য ডিউ ডিলিজেন্স, বিধিগত ও চুক্তিগত সমঝোতা দরকার হবে।

এরই মধ্যে তৎপর বিরোধীপক্ষের তরফে হাল ধরার জন্য কিছু তাঁবেদারকে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদের অভিযোগগুলো হলো :

নাগরিকদের ভাড়া ও পরিষেবা মান ব্যাহত হবে।

লিজ কালখণ্ড নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং ভারতের ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তারা এই সময়কে যথাসাধ্য বাড়িয়ে নেবে; তারা সম্পদ হাতছাড়া করবে না যতদিন পারবে না যতদিন পারবে আঁকড়ে থাকবে।

রাজস্ব বণ্টনের কথা কিছু বলা হয়নি। নতুন সম্পদকে না দিয়ে ভালো চালু লোভনীয় সম্পদগুলোকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেল ও জাতীয় সড়ক দেউলিয়া হয়েছে। যেসব রুট লাভদায়ক সেগুলোর টাকা দিয়ে অলাভজনক রুটগুলোকে চালানো হয়। এখন সেটা হবে না। যেসব ব্যাঙ্ক জাতীয় সড়কে ঋণ দিয়েছে তারা দেউলিয়া হয়ে পড়বে।

বৃহৎ বন্দর ও কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং যেমন বিএসএনএল ও এমটিএনএল তাদের ভারতনেট ফাইবার ১৪৯১৭ মোবাইল টাওয়ার ও ডাটা ব্যাকবোন হারাবে। এরাই বেশিরভাগ রাজস্ব আদায় করে, সেই জায়গাটা নিয়ে নেবে জিও ফাইবার নেট। বিএসএনএল ও এমটিএনএল বন্ধ হয়ে যাবে। আইওসিএলের পাইপলাইনে রিলায়েন্সের অবাধ অধিগম্যতা আছে।

বেসরকারি কোম্পানিগুলো সস্তা প্রযুক্তি ও উপকরণ ব্যবহার করে; এমন অদ্ভুত অভিযোগ করা হয়েছে যে ২০১৪ সালে রিলায়েন্স ইন্ডিয়া নির্বাচনের খরচ জুগিয়েছিল সেটা এইভাবে শোধ দেওয়া হবে। এর কোনো ভিত্তি নেই।

লিজের ভাড়া সম্পদের মূল্যের ভিত্তিতে করা উচিত। সেটা যদি চালু ভাড়ার ভিত্তিতে করা হয় তবে খুব সহজেই কারচুপি করে তা করা যায়। ন্যাশনাল মানিটাইজেশন পাইপলাইনে 'সম্পদের দাম নির্ধারণ' পদ্ধতিতে করা হবে। এটাই ছিল ২জি ঘোটালার মূল কারণ। দ্বিতীয়ত, সরকার দাবি করেছে যে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে সম্পদ বা এন্টারপ্রাইজের মূল্য নির্ধারণ হবে। সম্পদের মূল্য নির্ধারিত হয় মূল মূল্য (ওই সম্পদ অর্জন করতে যে খরচ করা হয়েছিল) থেকে ক্রমপুঞ্জিত ডেপ্রিসিয়েশন বা অবক্ষয় মূল্য বাদ দিয়ে ও তার বিপরীতে ডেপ্রিসিয়েশন রিজার্ভ তহবিল ধরে। ঘটনা হলো সরকারি সম্পত্তির শতকরা ৯০ ভাগ পুরোটাই অবক্ষয় বা ডেপ্রিসিয়েশন বাদ হয়ে যায় আর কোনো সম মূল্যের ডেপ্রিসিয়েশন তহবিল থাকে না। এতে যে জমিতে সম্পদ অবস্থিত তা অনেক বেশি আকর্ষণীয় হয়।

এতে করে বেসরকারি লিজহোল্ডারদের থেকে কোনো গ্যারান্টি পাওয়া যায় না যে, যে ইউনিটগুলো চালু হবে বা তাদের আধুনিকীকরণ হবে। তৃতীয়ত, সম্পদের অবস্থা যত করুণ হবে তত বেশি করে তারা ওই লিজের কালখণ্ড বা পিরিয়ড বাড়িয়ে নেবে। এ ব্যাপারে তাদের সহায়তা করবে ভারতের ভঙ্গুর বিচার ব্যবস্থা।

যে বিচার ব্যবস্থাকে এঁরা ভঙ্গুর বলছেন তার ভিত্তিতে কিন্তু মূলত বহু অনৈতিক কাজ তাঁরা করছেন। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা দীর্ঘসূত্রী হতে পারে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে ভঙ্গুরতার অভিযোগ ভারতের সংবিধানকেই দৃশ্যত অপমান করে। আর এই লিজ ফিরিয়ে নেওয়ার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা বা কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই এরা উপভোক্তাদের যথেচ্ছ শোষণ করবে, কারণ প্রশাসনের কোনো সৎ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই একথা যে ভুল। এদের তোলা অভিযোগগুলো সবই কাল্পনিক ও নেতিবাচক।

ঋণ স্বীকার : শ্রীসন্দীপ চৌধুরী, অর্থ মন্ত্রকের তথ্য।

মালীর উপস্থিত বুদ্ধিতে হতবাক ব্রিটিশ পুলিশ

পার্থসারথি বসু

ভারত যেদিন ছিল পরাধীন
হে বাঘাযতীন বীর
রক্তে সেদিন করেছিলে লাল
বুড়িবালামের তীর
লয়ে পাঁচজন ছোরা সাথে রণ
সমুখে কে জন ধায়
সে সমরেন্দ্র বাঘা যতীন্দ্র
সন্দেহ নাহি তায়—

ছোরা নিয়ে লড়েছিলেন বাঘের সঙ্গে। জিতেছিলেন। টেগার্টের বাহিনীর সঙ্গেও অসম লড়াই। এখানেও জিতেছিলেন। দেশজননীর পায়ে প্রাণের অর্ঘ্যে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী।

স্কুলজীবনে কবিতা লিখতে গিয়ে এইসব লেখা। সেসব খাতা রাখার মতো নয়। হারিয়ে গেছে। কিছুদিন আগেই বাঘা যতীনের জন্মদিনে স্মৃতিতে ভেসে উঠল।

থাকতাম বাগনানে। বাগনান কটক রোডের ধারে। থানার পাশে। পরে কটক রোড বহরে বেড়ে নাম দিল বম্বে রোড। শহরকে বাঁচাতে বাঁকা ধনুকের মতো খাদিনান লাইব্রেরি মোড় থেকে পাশ কাটিয়ে হিজলক মোড়ে আবার সিধে হলো। ধনুকের জ্যা যেটি পড়ে রইল তার নতুন নাম দিলেন কেউ কেউ ওড়িশা ট্রাঙ্ক রোড, সংক্ষেপে ও টি রোড। বম্বে রোড পরে হলো এন এইচ সিক্স।

কথায় ফিরি। কটক শহরটি বাঘা যতীনের মহাপ্রস্থানের স্মৃতিবিজড়িত। আর বাগনান হাই স্কুল। শেষ যুদ্ধের আগে এই স্কুলেই ছিলেন তাঁর আত্মগোপন পর্বে।

আমিও ওই স্কুলেরই ছাত্র ছিলাম। গর্ব হয়।

সেকালের একটি সংকলিত গল্প।

স্বাধীনতা সংগ্রাম স্পষ্টত দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছিল।

এক, গান্ধীজীর আপোশকামী অহিংস ধারা। দুই, মাস্টারদা সূর্য সেন এবং বাঘাযতীন প্রমুখের সহিংস ধারা। সাধারণ মানুষের অবস্থান ঠিক কি ছিল? বিপ্লবীরা জনসমর্থন পেয়েছিলেন?

অপ্রিয় প্রশ্ন। তবে বাঘাযতীন ও তাঁর সঙ্গীদের ধরিয়ে দিয়েছিল সাধারণ গ্রামবাসীরাই।

বাগনান স্কুলের এই গল্পটি ব্যতিক্রমী।

বাগনান হাই স্কুল তখন ছিল রথতলা ময়দানে। বাড়িটি এখনও আছে। পাশেই দুলে পাড়া।

বাঘাযতীন তখন এই স্কুলেই শিক্ষকের ভূমিকায় আত্মগোপন করেছেন। একদিন পুলিশ এসে হাজির। সাহেব বড়কর্তাও।

বাঘাযতীন সেদিন স্কুলে ছিলেন না। কিন্তু হেড মাস্টার মশায় বিপদে পড়লেন। বাঘাযতীন ইতিমধ্যেই তাঁদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। বুড়িবালাম যাওয়ার আগে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় হচ্ছিল। স্কুল ঘরের মেঝেয় তার কিছু তখনও ছড়ানো রয়েছে।

যা হবার হবে। ঠাণ্ডা মাথায় হেড মাস্টার মশায় স্কুল প্রাঙ্গণে খোলা মাঠে সাহেবদের চেয়ার আনিয়ে বসতে দিলেন। তল্লাশি করবেন, করুন। তার আগে অতিথি আপ্যায়ন।

এলাকাটি পুলিশ দিয়ে ঘেরা। হেড মাস্টার মশায় ভেবে পাচ্ছেন না কি করে সামলাবেন পরিস্থিতি।

স্কুলের মালী, এসে মাস্টারমশায়কে জিগ্যেস করল— সায়েবারা এয়েছেন। তেষ্টার জল আনি মশাই?

হেড মাস্টারমশায় অন্যমনস্ক হ্যাঁ বলার আগেই স্কুলে ঢুকে জল রাখার মাটির জালাটি কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। জল আনল অচিরেই। সাহেবরা তল্লাসীতে কিস্যু পেলেন না।

মালী মাটির জালায় পুরে সব অস্ত্র বার করে নিয়ে গেছিল। 'বাবু'রা তাকে বিপ্লবের শামিল করেননি কখনও। তবু সে বুঝেছিল এনারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়ছেন। সেই স্বাধীনতার অধিকার তারও।

কাহিনিটি বাগনানের পুরনো ইতিহাস সংকলনের একটি কমিটি সংগ্রহ করেছিলেন। তখন আমি পড়তাম ক্লাস নাইনে। কমিটির প্রধান ছিলেন বাগনান কলেজের অধ্যাপক জগন্নাথ সাহু। জানি না সেসব কাগজপত্র, নথির কী হলো।

কত অনামী অজানা মানুষের কতো অবদান!

আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি।

এস আর যাও

কোনো এক গ্রামে এক ধনবান লোক বাস করত। তার নাম ছিল হারাধন। হারাধনের অনেক সম্পত্তি আর জমিজায়গা ছিল। তার চাকরবাকর অনেক ছিল। লোকটি শক্তসমর্থ হলেও খুবই কুঁড়ে। সে কোনোদিন জমির ধারেকাছে যেত না। চাকরবাকরদের দিয়েই সে তার সব কাজ সারত। শুধু তাদের বলত জমিতে যাও। চাকরবাকররাও নিজেদের খেয়ালখুশি মতো কাজ করত। তারা খেতের কাজ ঠিকমতো না করে ঘরে বসে, এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে কিংবা গল্পগুজব করে কাটিয়ে দিত। জমি ঠিকভাবে চাষ করত না, ভালো করে সেচ দিত না, ঠিকমতো সার দিত না, সময়মতো বীজ ফেলত না জমির একটি ঘাসও নিড়াত না। ফলে তার জমি আগাছায় ভরে গেল। কিছুদিন পর হারাধনের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল।

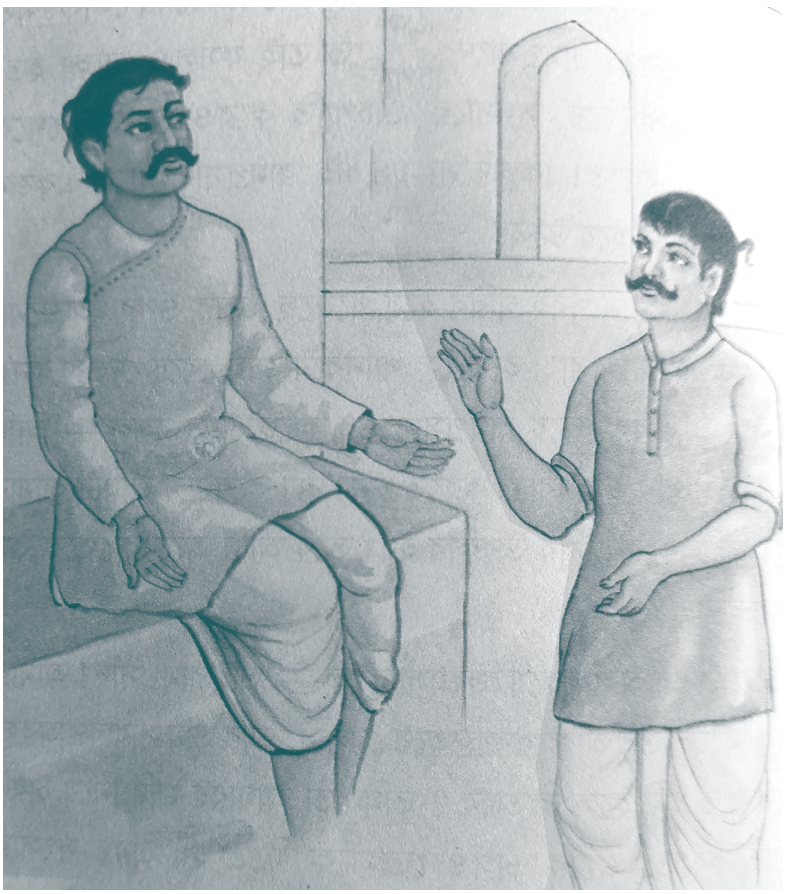

ওই গ্রামে রামপ্রসাদ নামে আর একজন চাষি বাস করত। তার জমিজায়গা কিছু ছিল না। সে হারাধনের থেকে কয়েক বিঘা জমি নিয়ে ভাগে চাষ করত। রামপ্রসাদ ছিল খুব পরিশ্রমী। মুনিষদের নিয়ে সে মাঠে যেত। দেখেশুনে তাদের খাটাত আর নিজেও খাটত। তার জমিতে ঠিক সময়ে বীজ পড়ত, ঠিক সময়ে সার পড়ত, ঠিক সময়ে সেচ ও নিড়ানি দেওয়া হতো। ফলে তার জমিতে ফসলও ভালো হতো। মালিককে ভাগ দিয়ে, সংসারের খরচপাতি চালিয়েও অনেক ফসল থেকে যেত। সেসব বিক্রি করে টাকাপয়সা সঞ্চয় করে রাখত। কিছুদিনের মধ্যেই রামপ্রসাদ গাঁয়ে একজন অবস্থাপন্ন লোক হয়ে উঠল।

এদিকে হারাধন খুবই গরিব হয়ে পড়েছে, তার ওপর মহাজনের ঋণ বাকি পড়েছে। বাধ্য হয়ে সে খানিকটা জমি বেচে দেওয়া মনস্থ করল। এই খবর পেয়ে রামপ্রসাদ তার কাছে এসে বলল– আমি শুনলাম আপনি জমি বিক্রি করতে চান, দয়া করে জমিটা যদি আমার কাছে বিক্রি করেন তাহলে খুব উপকার হয়। আমি ন্যায্য দাম দিয়েই কিনব। হারাধন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল— 'ভাই রামপ্রসাদ! আমার কাছে এত জমি ছিল তবু আমি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেলাম আর তুমি সাধারণ অবস্থা থেকে এত ধনী হলে কীভাবে? তুমি তো আমারই জমি নিয়ে চাষাবাদ করতে, ফসলের ভাগও আমাকে দিতে হয়। আমার জমি কিনতে এতগুলি টাকা তোমাকে কে দিল?'

রামপ্রসাদ বলল— 'আমাকে টাকা কেউ দেয়নি। টাকা তো আমি জমির ফসল বাঁচিয়ে জমিয়েছি। আপনার চাষবাসে আর আমার চাষবাসে অনেক তফাত আছে। আপনি চাকরবাকরদের শুধু 'কাজে যাও' বলে বাড়িতে বসে থাকেন। এজন্য আপনি গরিব হয়ে গেলেন। আপনার জমিজায়গা বিক্রি হয়ে গেল। আমি কিন্তু চাকরবাকররা আসার আগেই নিজে কাজের জন্য তৈরি হয়ে যাই, ওরা এলে বলি আমার সঙ্গে এস। ওদের সঙ্গে নিয়ে জমিতে যাই, তদারকি করি আর আমি নিজেও ওদের সঙ্গে কাজ করি। এর ফলেই আমি ধীরে ধীরে ধনী হয়ে গেলাম।'

এবার হারাধন ব্যাপারটা ঠিকমতো বুঝতে পারল। সে সামান্য জমি রামপ্রসাদকে বেচে দিয়ে ঋণ শোধ করল আর বাকি জমিতে নিজে পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই হারাধনের আর্থিক অবস্থা ফিরে গেল। সে আবার আগের মতো সুখী ও অবস্থাপন্ন হয়ে উঠল।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

অপূর্ব সেন

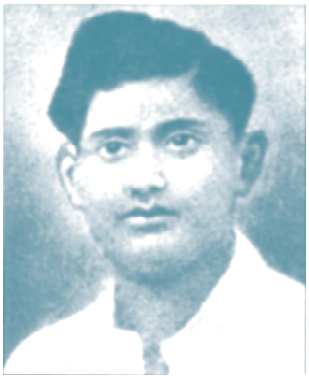

বিপ্লবী অপূর্ব সেন ১৯১৫ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবম-দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় চট্টগ্রামে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। অপূর্ব তখনই সেই আন্দোলনে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনা মাস্টারদা সূর্য সেনের চোখে পড়ায় তাকে বিপ্লবীদলে ভর্তি করে নেন। ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল তিনি মাস্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তারপর পাটিয়ার সাবিত্রীদেবীর বাড়িতে আত্মগোপন করে থাকার সময় ১৯৩২ সালের ১৩ জুন পুলিশের সঙ্গে গুলিযুদ্ধে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করেন। তাঁরই গুলিতে ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামেরুন নিহত হয়।

জানো কি?

- ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের পক্ষ থেকে পতাকা বহন করেন পিভি সিন্ধু।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম বিশ্বকবি সম্বোধন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।
- নরেন্দ্রনাথ দত্তকে স্বামী বিবেকানন্দ নামে ভূষিত করে ক্ষেত্রীর মহারাজা অজিত সিংহ।
- সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রের নাম ফ্যাদোমিটার।
- বৃষ্টির জলে ভিটামিন-১২ থাকে।
- আমাজন পৃথিবীর সবচাইতে ঘন জঙ্গল।

ভালো কথা

কালু

আমাদের বাড়ি থেকে পিসিমণিদের বাড়ি চার কিলোমিটারের রাস্তা। সেবার টোটোর পিছনে দৌড়ে দৌড়ে পিসিমণির সঙ্গে কালু এসেছিল। তিনদিন পরে পিসিমণির সঙ্গে কালুও ফিরে যায়। পরের মাসে একদিন কালু এসে হাজির। ঠাম্মি বলল কালু এসেছিস, থাকবি তো? কালু ঠাম্মির কথায় লেজ নাড়াতে লাগল। তিনদিন পরে কালু পিসিমণিদের বাড়ি চলে গেল। পরের মাসে আবার এসে হাজির। সেবার আমি তিনদিনের মাথায় দাদার (পিসতুতো) নামে একটি চিঠি কালুর গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। ওটা নিয়ে কালু চলে গেল। পরের মাসে কালু এসে হাজির। দেখি ওর গলায় চিঠি ঝুলানো। খুলে দেখি দাদা লিখেছে 'কালু আমাদের ডাকহরকরা'। এভাবে কালুর নিয়মিত যাওয়া-আসা এখনো চলছে।

মৃন্ময় সরকার, নবম শ্রেণী, ত্রিমোহিনী, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রার্থনা

নন্দিতা পাল, পঞ্চম শ্রেণী, পতিরাম, দঃ দিনাজপুর।

মহামারী করোনা
আর যেন আসে না।
কবে থেকে খেলাধুলা স্কুল বন্ধ
বাড়িতে বসে বসে হয় দম বন্ধ।
ভগবানে করি প্রার্থনা
মহামারী আর যেন আসে না।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

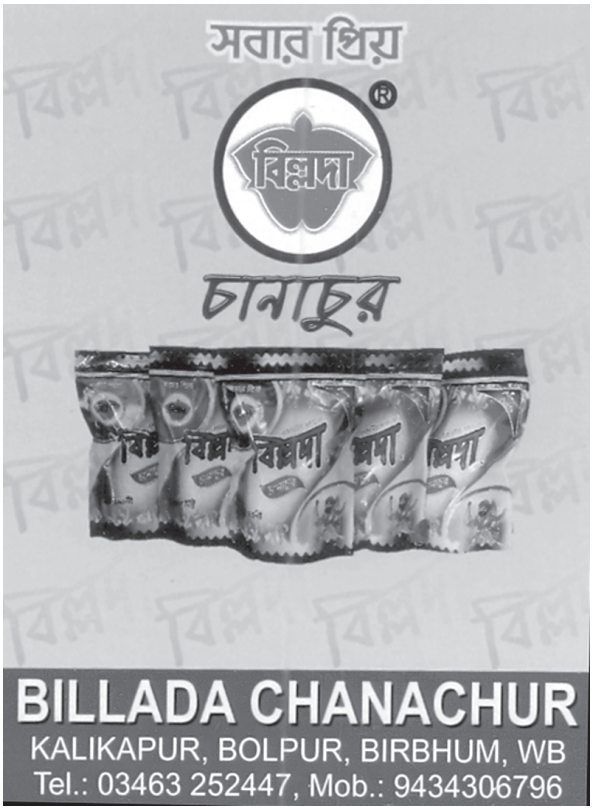

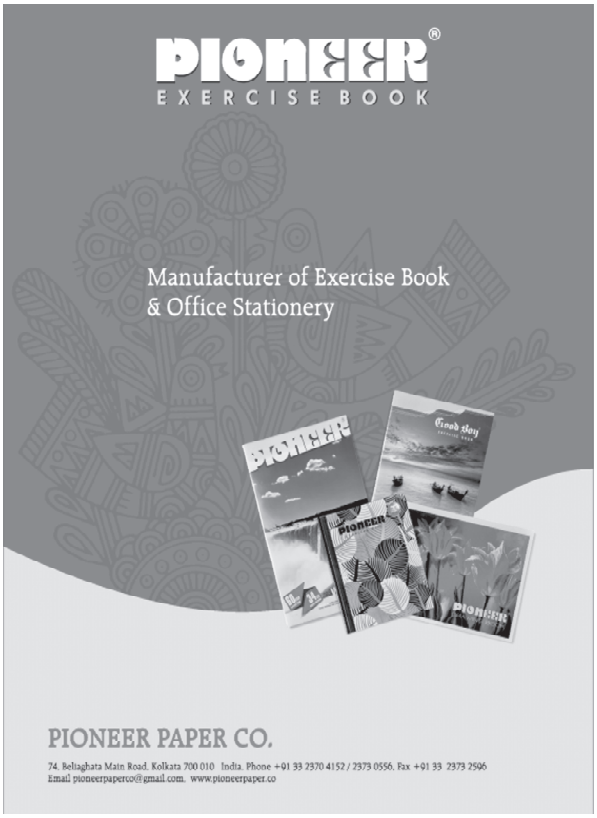

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বামপন্থীদের মোপলা জামাইদের প্রতি আদিখ্যেতা

বিনয়ভূষণ দাশ

কেরালার মালাবার উপকূলের মোপলা বিদ্রোহের কুখ্যাত নায়ক ভরিয়ামকুন্নাথ কুঞ্জ আহমেদ হাজিকে নিয়ে বিতর্ক যেন থামতেই চাইছে না। এর আগে তাকে নিয়ে বিতর্কিত সিনেমা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব হিস্টরিক্যাল রিসার্চ তাঁদের 'ডিকশানারি অব মারটারস (martyrs) অব ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল' থেকে মোপলা বিদ্রোহের তথাকথিত নায়ক ভি কুঞ্জা আহমেদ হাজি, আলি মুসালিয়ার-সহ ৩৮৭ জন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে তাদের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। ফলে বরাবরেই মতোই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট দলের বড়ো গোঁসা হয়েছে। আর তা এতটাই যে দলের সদস্য তথা কেরল বিধানসভার স্পিকার এম বি রাজেশ ক্রুদ্ধ হয়ে হাজিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী ভগৎ সিংহের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে দিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই দেশপ্রেমিক দলসমূহ এবং বিজেপি এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

এখন একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক মোপলা কারা। মোপলারা হলো আরব দেশ থেকে আগত এক উগ্র, গোঁড়া মুসলমান বণিক সম্প্রদায় যারা অষ্টম মতান্তরে নবম শতাব্দীতে ভারতের কেরালার মালাবার উপকুল অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তারা এদেশের হিন্দু মহিলাদের বিয়ে করে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। আদতে কথাটা হলো 'মাপ্পিল্লা' অর্থাৎ 'জামাই', মানে এদেশের মহিলাদের জামাই বা স্বামী। এদেরই উত্তরপুরুষ হলো এই মোপলা সম্প্রদায়। আর ভি কুঞ্জা আহমেদ হাজি এই গণহত্যায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এক কুখ্যাত চরিত্র। অন্যান্য যারা এই দাঙ্গায় জড়িত ছিল তারা হলো ইয়াকুব হাসান, আবু বকর মুসালিয়ার, আলি মুসালিয়ার, সি আই কয়া থাঙ্গাল ইত্যাদি দুষ্কৃতীরা। এই দাঙ্গা মালাবারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরনাড, পোন্নানি, ওয়াল্লুভানাড ইত্যাদি তালুকে ছড়িয়ে পড়ে। এই আহমেদ হাজিকে ইতিবাচক, সমন্বয়বাদী চরিত্র হিসেবে চিত্রিত করা হচ্ছে। বাস্তবে দাঙ্গা লাগানোর জন্য এই কুঞ্জা আহমেদের বাবাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কুঞ্জা আহমেদ ১৯২১-এর দাঙ্গা ও হিন্দু গণহত্যার প্রধান পাণ্ডা। এই দাঙ্গায় তাঁর নেতৃত্বে হাজার হাজার হিন্দু হত্যা, জোরজবরদস্তি ধর্মান্তর, হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ, শিশুহত্যা, হিন্দু সম্পত্তি ধ্বংস ও মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। সে মালাবার অঞ্চলে আল-দাউলা বা ইসলামি রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং তাঁর অধীনস্থ অঞ্চলে হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করা হতো। চার মাসের বেশি সময় ধরে তাদের এই তাণ্ডব চলেছিল।

> **ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মোপালাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকৃতি অটুট রাখার দাবিতে এবার আসরে নেমে পড়েছেন কেরালার সিপিএম সরকারের স্পিকার এম বি রাজেশ। এই স্পিকার মহোদয় জঘন্য হিন্দু হত্যাকারী কুঞ্জা আহমেদ হাজিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী ভগৎ সিংহের সঙ্গে তুলনীয় এক স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে চিত্রিত করেছেন।**

অনেকেই, বিশেষত বামপন্থীরা দক্ষিণ ভারতের উত্তর কেরালার মালাবার উপকূলের মুসলমান কৃষকদের মোপলা বিদ্রোহকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন। শুরুতে এই বিদ্রোহের প্রকৃতি কিছুটা ব্রিটিশ বিরোধী হলেও পরবর্তী ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে ১৯২১-এর এই বিদ্রোহকে কিছুতেই ব্রিটিশবিরোধী বলা চলে না। এই বিদ্রোহ পুরোপুরি হিন্দুদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল। ইংরেজ ও হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে লড়তে কেন মন্দিরভাঙা, গোহত্যার প্রয়োজন হবে? কেন সাধারণ হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়োজন হবে? বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই মোপলা বিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করেছেন। শতবর্ষ পূর্বে, ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট শুরু হওয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন নেহরুবাদী ও বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা। বাস্তবে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শুধু মোপলা নয়, দেশপ্রেমী হিন্দু স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং অন্য ভারতীয়দের উপরও ভয়াবহ অত্যাচার করেছে। কিন্তু সেজন্য হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করতে দেখা যায়নি। আর মোপলারা ইংরেজদের উপর নয়, অত্যাচার শুরু করল হিন্দুদের উপর। প্রখ্যাত সাংবাদিক দুর্গাদাস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক India - From Curzon to Nehru and After গ্রন্থে লিখেছেন, 'Mohammed Ali's speeches in South India, it was alleged, had inflamed the religious passions of the Muslims. Besides, reports of the non-cooperation and Khilafat movements had incited the

ফঃ ৬

Moplahs of Malabar, the descendents of Arab traders. The worsts victims of their fanaticism were Hindus, who suffered rape, loot, conversion and murder.'' (p. 81)। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক মাইকেল এডওয়ার্ডস তাঁর British India, 1772–1947 গ্রন্থে লিখেছেন, 'In August 1921, the Moplahs–a Muslim community in Malabar–started a holy war against Hindus and, by doing so, revived searcely latent communal tensions.'' । অন্যদিকে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রকাশিত বিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরীর 'বিভক্ত ভারত' গ্রন্থে লেখা হয়েছে, ''দুঃখের বিষয়, অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের অহিংস ভিত্তির কথা তাহাদের নিকট পৌঁছে নাই; .....অর্ধশিক্ষিত ও ধর্মান্ধ মোল্লাদের কাছে ইহারা যাহা শুনিয়াছে তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। তাহাদের বলা হইয়াছে যে, এই 'শয়তান' গভর্মেন্টের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলাম জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। আর হিন্দুরাও কাফের, সুতরাং কোনো স্থান মোপালারা দখল করিয়া সেখানে স্বাধীন ইসলামি দেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। তাহারা থানা পোড়াইয়া, কোষাগার লুট করিয়া, হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া সমস্ত ধ্বংস করে এবং বহু ইউরোপীয় এবং হিন্দু হত্যা করে। হিন্দুদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল'' (পৃষ্ঠা ২৫–২৬)। এটা সর্বজনবিদিত যে, মোপলা বিদ্রোহ নিয়ে মতপার্থক্যের জন্য সাভারকর গান্ধী ও কংগ্রেস সম্পর্কে বিদ্বিষ্ট হয়ে পড়েন।

মালাবারের এই মোপলা বিদ্রোহ বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বি আর আম্বেদকর ও অ্যানি বেসান্ত ত্রয়ীকে একত্রিত করেছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছেন এবং এই বিদ্রোহকে হিন্দুবিরোধী গণহত্যা হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত, ওখানকার তৎকালীন ডেপুটি কালেক্টর সি গোপালন নায়ারের লেখা The Moplah Rebellion, 1921-এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লেখা হয়েছে 'Murders, dacoities, forced conversions and outrages on Hindu women became order of the day'. । আবার ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর তাঁর Pakistan or The Partition of India গ্রন্থে এই বিদ্রোহ বা গণহত্যার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে লিখেছেন, ''As a rebellion against the British Government it was quite understandable. But what baffled most was the treatment accorded by the Moplas to the Hindus of Malabar,'' 'The Hindus were visited by a dire fate at the hands of the Moplas. Massacres, forcible conversions, desecration of temples, foul outrages upon women, such as ripping open pregnant women, pillage, arson and destruction.....in short, all the accompaniments of brutal and unrestrained barbarism were perpetrated freely by the Mopals upon the Hindus.'' বামপন্থীদের অনুসারী কৃষক বিদ্রোহই বটে! জমি লুণ্ঠন ও জবরদখলকে যারা স্বাভাবিক ভূমিসংস্কার বলে আখ্যাত করতে অভ্যস্ত তাঁরা একে কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে চিহ্নিত করবেন তাতে অবাক হবারই-বা কী আছে! সরকারি হিসেবেই এই গণহত্যায় ২২৬৬ জন নিহত, ১৬১৫ জন আহত হয়। বাস্তবে সংখ্যাটা আরও বেশি, মোট ২০,৮০০ জন হিন্দুকে এই গণহত্যায় হত্যা করা হয়েছিল এবং ৪০০০ হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম স্বাধীনতা সংগ্রামী অ্যানি বেসান্তের মতে, 'They established the Khilafat Raj, crowned a King, murdered and plundered abundantly, and killed or drove away all Hindus who would not apostatize. Somewhere about a lakh people were driven from their homes with nothing but the clothes they had on, stripped of everything.' আর এই ধরনের দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাভারকরের তীব্র মতামত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তিনি তাঁর পুস্তক 'মোপলা'তে এই বিদ্রোহকে হিন্দুবিরোধী গণহত্যা হিসেবে গণ্য করেছেন।

আগেই বলেছি, ভরিয়ামকুন্নাথ কুঞ্জা আহমেদ হাজি, আলি মুসালিয়ার-সহ আরও ৩৮৭ জন তথাকথিত 'মোপলা শহিদ'কে 'Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle'-এর পঞ্চম খণ্ডের তালিকা থেকে তিন সদস্যের এক প্যানেলের সুপারিশের ভিত্তিতে বাদ দেওয়া হয়েছে। কারণ আইসিএইচআর-এর নিযুক্ত ওই সদস্যরা সমস্ত তথ্য বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন, ১৯২১-২২ সালে কেরালার মালাবার উপকূলে সংঘটিত ওই বিদ্রোহ আসলে সশস্ত্র কৃষকদের ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম নয়, ওটি ছিল মালাবার উপকূলের হিন্দুদের বিরুদ্ধে এক সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ এবং ওই অঞ্চলে 'ইসলামি খলিফাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানমাত্র। এটা নিঃসন্দেহেই বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের জন্য যথার্থ পদক্ষেপ। আর এই পদক্ষেপ নেওয়াতেই ক্ষেপে উঠেছে বামপন্থীরা ও তাঁদের স্তাবক ঐতিহাসিকবৃন্দ। এমনকী এইসব ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মোপালাদের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে স্বীকৃতি অটুট রাখার দাবিতে এবার আসরে নেমে পড়েছেন কেরালার সিপিএম সরকারের স্পিকার এম বি রাজেশ। এই স্পিকার মহোদয় জঘন্য হিন্দু হত্যাকারী কুঞ্জা আহমেদ হাজিকে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী ভগৎ সিংহের সঙ্গে তুলনীয় এক স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। আসলে ধর্মান্ধ ওয়াহাবিপন্থী বাঙ্গলার তিতুমির, কেরালার ওয়াহাবি কুঞ্জা আহমেদ হাজি, মহীশূরের অত্যাচারী, ধর্মান্ধ, নিষ্ঠুর শাসক টিপু সুলতান বা বাঙ্গলার অত্যাচারী নবাব সিরাজদ্দৌলা—এঁদের সবাইকে দেশপ্রেমের তকমা পরাতে সিপিএম ও বামপন্থীরা যেন সদাই উদগ্রীব। বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীভি মুরলীধরণ কেরালা সরকারের এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করে যথার্থ কাজই করেছেন। তিনি যথার্থই বলেছেন, ''অজ্ঞতা দোষের নয়, কিন্তু সস্তা রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক লাভের জন্য অজ্ঞতার ভান করা নিঃসন্দেহেই নিন্দার্হ।'' কেরালার আর এক সংগঠন 'হিন্দু ঐক্য বেদি' ঘোষণা করেছে, সরকার যেখানেই হাজিকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং মোপলা বিদ্রোহের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের আয়োজন করবে তাঁরা সেখানেই 'কালাদিবস' পালন করবে। ঐতিহাসিক সি আই আইজ্যাক বলেছেন, 'এটা বাস্তবে জেহাদি আন্দোলন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ওই অঞ্চলে একটা ধর্মীয় রাজ্য বা খলিফাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। ফলে এই ধরনের একটা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে জাতীয়তাবাদী রং দেওয়া অন্যায় ও অযৌক্তিক।'

বামপন্থীরা ওঁদের 'জামাই' আদরে রাখতে চাইলেও সমগ্র দেশ কিন্তু ওঁদের বিস্মৃতির অন্তরালে নিক্ষেপ করবেই। ইতিহাসের বিকৃতি সংশোধিত হবেই। □

ভারতের শরিয়তপ্রেমীরা এবার আফগানিস্তান চলে যাক

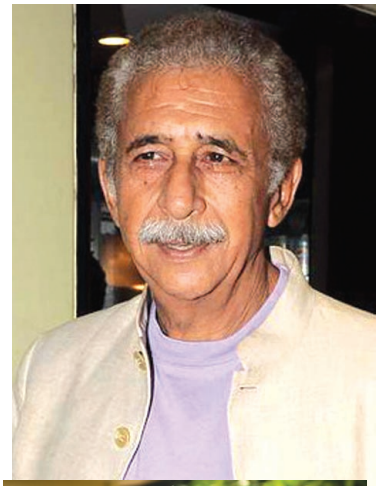

নাসিরুদ্দিন শাহ

জাভেদ আখতার

যারা জান্নাতুল ফেরদৌস হাসিল করার জন্য এ দেশের কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ। পাকিস্তান তো তার গেট খুলে দিয়েছে। এদেশের শরিয়তিরা সুড়ুৎ করে পাকিস্তানে গলে আফগানিস্তানে গিয়ে তালিবানদের সমর্থনে কালাশনিকভ হাতে তুলে নিক। তবেই তো জান্নাতুল ফেরদৌস কবজা হয়ে যায়।

ডাঃ নিত্যগোপাল চক্রবর্তী

তালিবানরা আফগানিস্তানের দখল নিয়েছে। তারা গায়ের জোরে বন্দুকের নল উঁচিয়ে আশরাফ ঘানি সরকারকে উচ্ছেদ করেছে। ঘানি সাহেব দেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন। সেনাবাহিনী ভেঙে পড়েছে। বিনা রক্তপাতে (?) শান্তিপূর্ণ উপায়ে (?) ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছে। তালিবানরা বিমানবন্দর, সংসদ ভবন, রেডিয়ো স্টেশন, অস্ত্রাগার-সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গার দখল নিয়েছে। তালিবানদের একমাত্র উদ্দেশ্য আফগানিস্তানকে ইসলামি দেশে পরিণত করে সে দেশে শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠা করা। প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে তারা প্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান দেশের নাম পালটে 'ইসলামিক আমিরশাহি অব আফগানিস্তান' নাম দিয়েছে। মহিলাদের বোরখা পরিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাদের বাড়ির বাইরে নিষ্ক্রমণ, হাট-বাজার চাকরিবাকরি, লেখা পড়া-সহ আরও বহু কিছু নিষিদ্ধ হয়েছে। মহিলা বিউটি পার্লার বন্ধ হয়েছে, এমনকী বিউটি পার্লারে মহিলার ছবি মুছে ফেলা হয়েছে। এসবই করা হয়েছে শরিয়তি আইন অনুসারে।

এখন দেখা যাক, শরিয়তি আইন ব্যাপারটা ঠিক কী? শরিয়তি আইন বা শরিয়াহ হলো কুরআন ও হাদিস নির্দেশিত মুমিন মুসলমানের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবনশৈলী ও দিকদর্শন। একজন প্রকৃত মুসলমান পুরুষ বা মহিলা কীভাবে তার জীবন কাটাবে, সে কী কী করতে পারবে আর কী কী করবে না, জন্ম, শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান উৎপাদন, জেনা, সম্পত্তির অধিকার, আইন, বিচার ব্যবস্থা, ধর্মান্তরকরণ, কাফেরদের অর্থাৎ যারা অমুসলমান তাদের সঙ্গে ব্যবহার কেমন হবে, যুদ্ধ, জিহাদ, আক্রমণ, প্রার্থনা পদ্ধতি, মৃত্যু, শহিদ, গাজি, মৃত্যুর পর কী হবে ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত জীবন দর্শন তথা দিকনির্দেশই হলো শরিয়ত।

আর শরিয়াহ হলো কুরআন ও হাদিস নির্দেশিত পথ। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে রাষ্ট্রব্যবস্থা, অবশ্যই মুসলমানদের জন্য শাসন ব্যবস্থা। মুসলমান সে-ই যে 'লা শরিক আল্লাহ' তত্ত্বে একশোভাগ বিশ্বাসী হয়ে কুরআন ও হাদিস মোতাবেক জীবনযাপন করে সেই হলো প্রকৃত মুমিন মুসলমান। এমনকী আংশিক বিশ্বাসী ও আংশিক শরিয়ত পালনকারী হলো মুশরিক ও মুনাফিক। শরিয়তি আইনে কাফের বা অমুসলিম আর মুশরিক ও মুনাফিকের শাস্তি একই।

কুরআন কী? শেষ নবি হযরত মুহম্মদ সৌদি আরবের মক্কা শহর থেকে ৬ কিমি দূরবর্তী হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন হলেন। তখন তার বয়স প্রায় চল্লিশ বছর। তৃতীয় বর্ষে তিনি নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন। তার উপরে ওহি নাজিল হলো। জিবরাইল ফেরেশতা ওহি অর্থাৎ আল্লাহর বাণী নিয়ে মুহম্মদের কাছে এলেন ও তাকে পড়তে বললেন। হযরত মুহম্মদ নিরক্ষর ছিলেন, তিনি পড়তে লিখতে পারতেন না। তাই সুবা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত জিবরাইল ফেরেশতা তাকে পড়ে শোনালেন এবং মুহম্মদকে পরপর তিনবার আলিঙ্গন করলেন। আর মুহম্মদ পড়তে শুরু করে দিলেন। এরপর মক্কা-মদিনা-সহ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে মুহম্মদের উপরে মোট ১১৪টি সুরা ২৩ বছর ধরে নাযিল হয়। ৬২ বা ৬৩ বছর বয়সে তিনি মারা যান। যখনই যা ওহি নাযিল হতো তখনই তা তিনি উম্মতদের শোনাতেন। তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমানের নেতৃত্বে কুরআনের সুরা সমূহের ক্রমা রচিত হয়। ১১৪টি সুরা বা অধ্যায় এবং ৬৬৬৬ টি আয়াত বা পঙ্‌ক্তি সমৃদ্ধ আরবি ভাষায় লিখিত কিতাবই হলো কুরআন অর্থাৎ কুরআন হলো আল্লাহতালা প্রেরিত ও মুখনিঃসৃত বাণী সমূহ।

কিন্তু সব সুরার বিস্তারিত ব্যাখ্যা কুরআনে না থাকায় মুহম্মদ নিজে সেই সব সুরার

বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং নিজের জীবনে মুহম্মদ যা যা বলেছেন ও উনি নিজে যা যা করেছেন এসবের সমষ্টি হলো সুন্নাহ বা হাদিস। আর শরিয়াহ হলো কুরআন ও হাদিসের নির্দেশিত পথ। তাহলে মোদ্দাকথা এই দাঁড়ালো যে, শরিয়া মান্য করা এবং নিজের জীবনে তা পালন করা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের অবশ্যকর্তব্য। মুসলমান হয়েও যারা শরিয়া মানে না বা আংশিক মানে বা বিরোধিতা করে তারা হলো মুশরিক বা মুনাফিক। আর সমস্ত অমুসলিমরা হলো কাফের অর্থাৎ যারা আল্লাহ ছাড়া উপাস্য নাই অর্থাৎ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এই তত্ত্বে যারা বিশ্বাস করে না অর্থাৎ যাদের উপাস্য আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেউ , তারা সবাই কাফের। কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য শাস্তি শরিয়তি আইনে সুনির্দিষ্ট করা আছে। ক্রমানুযায়ী সেগুলি হলো হয় ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো জিজিয়া কর দাও, অন্যথায় শিরচ্ছেদ। আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ এবং পুরুষদের মুণ্ডচ্ছেদ। তবে মহিলাদের মুণ্ডচ্ছেদ নয়, ধর্ষণ। তা সে যেকোনো বয়সের মহিলাই হোক না কেন। সমস্ত বয়সের মহিলাই গনিমতের মাল, ধর্মান্তরণের পর তারা সবাই যৌনদাসী। মৃত্যুর পরেও নিস্তার নাই। পুরুষ বা মহিলা উভয়ের জন্যই হাবিয়া দোজখ সুনির্দিষ্ট। গনগনে আগুনে পুড়তে হবে। তবে মৃত্যু হবে না আগুনে পুড়ে, শুধু পুড়বে আর পুড়বে এবং আর্ত গগনভেদী চিৎকার করতে থাকবে। আর মুমিন মুসলমান যারা জিতবে তারা হবে গাজি। আক্রমণ করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায় তবে তারা হবে শহিদ। গাজি বা শহিদ উভয়েরই পুরস্কার একই– হুরি পরি সমৃদ্ধ জান্নাত উল ফেরদৌস। তারা অনন্ত অক্ষয় যৌবন ও হুরি পরি সম্ভোগ করে যাবে।

পক্ষান্তরে, হিন্দুস্থানের সংখ্যাগুরু মানুষ বলছে না না 'লা শরিক আল্লাহ' নয়, 'যত মত তত পথ', রাম রহিম একই । 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ সর্বজীবে ঈশ্বর বিরাজমান। 'একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি' অর্থাৎ পরমেশ্বর এক ও অভিন্ন, জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাকে বিভিন্ন নামে ডাকেন। এবং সবশেষে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' অর্থাৎ এই বিশ্ব চরাচরের সমস্ত মানুষই আমার পরম আত্মীয় অর্থাৎ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্ব শান্তি।

বিগত ২০১৪ সাল থেকে এই ভারত ভূমি হিন্দুস্থানে একজন হিন্দু প্রধানমন্ত্রী রাজত্ব চালাচ্ছেন। তার রাজত্বকালে কোনো সংঘটিত হিন্দু শক্তি মুসলমান পাড়া আক্রমণ করেনি, অগ্নিসংযোগ লুটতরাজ করেনি, মুসলমান রমণীদের ধরে এনে ধর্ষণ বা যৌনদাসী বানায়নি। মুসলমানদের জোর করে ধর্মান্তরিত করেনি, মুণ্ডচ্ছেদ করেনি। সারাবিশ্বে সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য তাঁর প্রয়াস প্রশংসিত হয়েছে। ফলে তিনি দেশনেতা থেকে বিশ্বনেতায় উন্নীত হয়েছেন। শান্তি পূর্ণ সহাবস্থানের ক্ষেত্রে তাঁর প্রশংসা আজ সারা বিশ্বে সুবিদিত। অন্ধকার যুগের দমন-পীড়ন নীতি 'তিন তালাক' লুপ্ত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমান রমণীরা দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছে এই হিন্দু প্রধানমন্ত্রীকে। একই দেশে দুটি জাতীয় পতাকা, দেশের বিশেষ অংশের মানুষ ব্যতিরেকে অন্য কেউ ওই বিশেষ অংশে জমি কিনতে পারবে না, ওই বিশেষ অংশের কোনো মহিলা দেশের বাকি অংশে বিয়ে করতে পারবে না, সর্বোপরি সংসদে কোনো আইন পাশ হলে তা ওই বিশেষ অঞ্চলে কার্যকরী হবে না, ইত্যাদি কালাকানুন বাতিল হয়েছে। একটি জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে বিবাদমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজার বছরের দীর্ঘস্থায়ী বিবাদ, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ভিত্তিতে উভয় পক্ষের কাছে সমভাবে গ্রহণযোগ্য করে, সন্তোষজনকভাবে সমাধান করা হয়েছে। ফলে ওই দীর্ঘস্থায়ী বিবাদের শান্তিপূর্ণ চিরস্থায়ী মীমাংসা হয়েছে। সিএএ এবং এনআরসি প্রসঙ্গ উঠতেই শরিয়তি পন্থীরা চিলচিৎকারে গেল গেল রব তুলে গলা ফাটিয়েছে। তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে অগ্নিসংযোগ ও সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছে, তা সবাই দেখেছে। কোনও মুসলিম সংগঠন বুক চিতিয়ে বলেনি যে তারা ভারতীয়, ভারত তাদের জন্মস্থান। তারা নিজেদের আরব সন্তান বলেই মনে করে। অবশ্য কুরআন, হাদিসে এ কথা লেখা আছে কিনা তা আমার জানা নাই। এই সমস্ত কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়নি। শরিয়তিরা তো বটেই, এই দেশে বসবাসকারী ভণ্ড মানবতাবাদী যথা—কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, তৃণমূল ,সমাজবাদী পার্টি ও অনেকে সুর চড়িয়ে তাল ঠুকেছে। বাধা প্রদান করেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে নিরস্ত করতে পারেনি। আর তাই তিনি আজ সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রগণ্য।

ফিরে আসি তালিবানি প্রসঙ্গে। তালিবানরা মুমিন মুসলমান। তাই তারা কাবুল বিমানবন্দরে অগ্নিসংযোগ করেছে, আফগান অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে, সাধারণ নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে, বাড়ি বাড়ি ঢুকে খাবার লুট ইত্যাদি সবই শরিয়তের বিধান অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে (?) করে চলেছে। এদেরকে সমর্থন জানিয়েছে তাদের দোসর কমিউনিস্ট চীন ও রাশিয়া। কমিউনিস্টরা নাকি ধর্ম, সম্প্রদায় এসব মানে না। কিন্তু তারা শরিয়াহ মানে। ভণ্ড আর কাকে বলে! কমিউনিস্টরা যে ভণ্ড, তা আজ সারা পৃথিবী জানে। শরিয়তি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ তালিবানিদেরকেই সমর্থন জানিয়েছে। বাংলাদেশে সংঘটিত মুসলিম আক্রমণের ফলে বাংলাদেশ আজ প্রায় হিন্দুশূন্য, ঠিক যেমন আফগানিস্তান। বর্তমানে আফগানিস্তানের ৯৯.৭ শতাংশ মুসলমান কিন্তু তা সত্ত্বেও নর্দান অ্যালায়েন্স, আফগান সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং আরও দু-একটি সংগঠন প্রাণপণে তালিবানদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তাজিকিস্তান রসদ জুগিয়ে সাহায্য করেছে নর্দান অ্যালায়েন্সকে। তাজিকিস্তানের শতকরা ৯৮ শতাংশ লোক ইসলাম মতাবলম্বী।

যে সমস্ত ভারতীয় শরিয়তপন্থীরা এদেশে সুখে নাই, অর্থাৎ যারা জান্নাতুল ফেরদৌস হাসিল করার জন্য এ দেশের কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে তাদের কাছে এ এক সুবর্ণ সুযোগ। পাকিস্তান তো তার গেট খুলে দিয়েছে। এদেশের শরিয়তিরা সুড়ুৎ করে পাকিস্তানে গলে আফগানিস্তানে গিয়ে তালিবানদের সমর্থনে কালাশনিকভ হাতে তুলে নিক। তবেই তো জান্নাতুল ফেরদৌস কবজা হয়ে যায়। তা না করে তারা ঘাপটি মেরে এখানে বসে আছে কেন? না গেলে তো কুরআন মোতাবেক তারা মুশরিক হয়ে যাবে, আর জাহান্নামে পতিত হবে, তাই না?

কমিউনিস্টদের মুরুব্বিরা তো তালিবানদের সমর্থন করেছে। কমিউনিস্ট ও তাদের দোসর ভণ্ড মানবতাবাদীরা এই সুযোগ হাতছাড়া হবার আগেই আফগানিস্তানের মাটিতে গিয়ে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে শামিল হচ্ছে না কেন? ভারতের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তার অবস্থান ও বক্তব্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ▯

তালিবান-আদর্শ বিরোধী মতাদর্শ গঠনে ব্যর্থতাই কি দায়ী আফগান-সংকটের জন্য

ড. সৌমিত্র চক্রবর্তী

মতাদর্শগত সংগ্রামের মোকাবিলা হয় বিরুদ্ধ মতাদর্শ দিয়েই। ইতিহাস এর প্রমাণ বার বার দিয়েছে। আমেরিকা এই মতাদর্শগত সংগ্রামের কাছে বার বার বশ্যতা স্বীকার করেছে এই বিরুদ্ধ-মতাদর্শ গঠনে ব্যর্থতা থেকেই— এই ধারণা অনেকাংশেই সত্য। গুলি-বোমা-বন্দুক দিয়ে উগ্রপন্থী আন্দোলন দমন করা যায়। কিন্তু সেই উগ্রপন্থার পিছনে যদি একটি মতাদর্শ থাকে, তাহলে অস্ত্র কিছু সময় সেই আন্দোলন দমনে সমর্থ হলেও, আন্দোলনকে একেবারে নির্মূল করতে পারে না। ওই উগ্রপন্থী মতাদর্শে পুষ্ট শক্তি সমূলে উৎপাটন করতে প্রয়োজন হয় সমাজে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ও শান্তি-সম্প্রীতিতে পুষ্ট মতাদর্শ। কিন্তু আমেরিকা এই সত্য কখনো অনুধাবন করেনি, যার ফলে বারংবার ব্যর্থতা এসেছে। ভিয়েতনাম ও ইরাকের সঙ্গে সাম্প্রতিককালে যুক্ত হয়েছে আফগানিস্তানের নাম।

ধর্মীয় মৌলবাদ যে কত ভয়ংকর হতে পারে, তালিবান তা চোখে আঙুল দিয়ে বিশ্বকে দেখিয়েছে। তালিবানি শাসনে বারংবার বিপন্ন হয়েছে আফগানিস্তানের মানবতা। সে বিংশ শতাব্দীর পরের দশকের ঘটনাই হোক বা সাম্প্রতিককালে তালিবানের পুনরায় আফগানিস্তান দখল হোক, চিত্রপট বদলায়নি এতটুকুও। গত ১৫ আগস্ট তালিবানের আফগানিস্তানের ক্ষমতা দখল সম্পূর্ণ হবার দিন থেকেই সারা বিশ্ব দেখছে আফগান জনতার অসহায়তা ও দেশ ছাড়ার তীব্র আকুতি। কিন্তু এই প্রবন্ধের পরিসরে এটা আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে যে, আফগানিস্তানের চারকোটি শান্তি, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকামী জনতা এবং আধুনিক সমরাস্ত্রে সুসজ্জিত তিন লক্ষাধিক আফগান সেনা কেন কয়েক হাজার তালিবানি সেনার মোকাবিলা করতে পারল না? কেন কার্যত বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করল? তথ্য অনুযায়ী, আফগানিস্তানের জনগোষ্ঠীর ৯৯.৭ শতাংশ মানুষ ইসলাম মতাবলম্বী। তাহলে কেন ইসলমান মতাবলম্বী মানুষ একটি ইসলামিক দেশে বিপন্ন বোধ করে জন্মভূমি পরিত্যাগ করতে এতটা ব্যাগ্র হয়ে উঠেছেন?

আফগান সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৯৬—২০০১-এর মধ্যে আফগানিস্তানের স্কুলগুলিতে মহিলাদের নিবন্ধন 'শূন্যে' পৌঁছেছিল। আর তালিবান সরকার পতনের

পর ২০০২-২০২১-এর মধ্যে আফগান স্কুলগুলিতে ছাত্রীর সংখ্যা সর্বোচ্চ নব্বইয়ে পৌঁছেছিল। এই পরিসংখ্যান বলে দিচ্ছে তালিবানের শাসনকালে ও তালিবান পরবর্তী অধ্যায়ে আফগান নারীদের সেকাল-একাল। শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, নারী-স্বাধীনতা, সুরক্ষা ও অধিকার যে তালিবানের কাছে 'সোনার পাথর বাটি'— ইতিহাস তাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে বারবার। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে আফগান নারীরা কেন গর্জে উঠছে না? সেখানকার শিক্ষিত, পরিশীলিত ও গণতন্ত্রপ্রিয় যুবসমাজ কেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ করছে না? উত্তরে আবার ঘুরেফিরে আসে সেই মতাদর্শের তত্ত্ব। 'মতাদর্শ' একটি মতবাদে বিশ্বাসী জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। ঠিক যেমনটি করেছে ইসলামি মৌলবাদে বিশ্বাসী তালিবানদের। উগ্রপন্থী মৌলবাদী মতাদর্শের মোকাবিলায়, ধর্মীয় উদারবাদীদের কোনও বিরুদ্ধ মতাদর্শ গড়ে ওঠেনি, যা তালিবানদের সঙ্গে আদর্শগত সংঘাতে যেতে পারে। তাই উদারবাদী আফগান নারী ও যুবসমাজকে তালিবানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধও করা যায়নি। তালিবানদের মধ্য থেকে মহম্মদ ওমর, আব্দুল ঘনি বরাদর ও হিবাতুল্লা আখুনজাদার মতো একের পর এক কট্টরপন্থী নেতা উঠে এসেছে, যারা কট্টর মৌলবাদীদের একত্রিত করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু উদারবাদী, উন্নয়নশীল, আধুনিক ও গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ আফগানদের তরফ থেকে এমন একজনও উল্লেখযোগ্য নেতা উঠে আসেননি যারা আফগানিস্তানের নাগরিক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারেন। তারই ফলশ্রুতিতে বারংবার তালিবানের উত্থান।

দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ আফগানিস্তানে তীব্র অনুন্নয়ন ও প্রান্তিক মানুষের কাছে ন্যূনতম সরকারি পরিষেবা না পৌঁছানোও এই সংকট উদ্ভবে অনেকাংশেই দায়ী। একথা সত্যি, বিগত দুই দশকে আফগানিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়নে হাজার হাজার কোটি ডলারের সাহায্য দিয়েছে আমেরিকা। ভারতও বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা সাহায্য করেছে দেশটির পরিকাঠামো ও সামাজিক উন্নয়নে। কিন্তু আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত আফগান প্রশাসনের জন্যে

সেই অর্থের খুব কম অংশই পৌঁছেছে প্রান্তিক স্তরে। ফলে গ্রামীণ মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভে ইন্ধন দিয়ে তালিবান নেতারা সেই গ্রামবাসীদের নিজেদের দলে টেনেছে। তৃতীয়ত, পশ্চিমি শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পুষ্ট প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আশরফ গনি আফগানিস্তানের মানুষের মন বুঝে উঠতে পারেননি। আফগান জনতাও দীর্ঘ সময় বিদেশে কাটানো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একান্ত হতে পারেনি। গনির উন্নয়নের ধারণা এবং আমেরিকার প্রতি অন্ধ আনুগত্যকে হাতিয়ার করে তালিবানরা আফগানিস্তানের সব থেকে পুরনো জনগোষ্ঠী পাখতুনদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী হাওয়া তৈরি করেছিল। তারই ফলস্বরূপ একটি বড়ো অংশের পাখতুন সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ নাগরিকদের সমর্থন আফগানিস্তান দখলে তালিবানদের বড়ো শক্তি জুগিয়েছিল। পাশতুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে তালিবান এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে, পাখতুন সম্প্রদায়ভুক্ত আফগান ন্যাশনাল আর্মির একটা বড়ো অংশ কার্যত তালিবানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে এবং সরকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে অস্ত্র-সহ তালিবনদের দলে নাম লিখিয়েছে।

কিন্তু এই প্রবল পরাক্রমী তালিবানদের— বিরুদ্ধ স্বরও আফগানিস্তানের মাটিতেই সরব হয়েছে বিগত কয়েক দশক ধরেই। আফগানিস্তানের পঞ্জশির প্রদেশ তালিবান-বিরোধী মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আহমেদ শা মাসুদ যাকে 'পঞ্জশিরের সিংহ' বলেও অভিহিত করা হয়। হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে তাজিক জনগোষ্ঠীর বাস, যারা সংখ্যার বিচারে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী পাখতুনদের পরেই। মতাদর্শগত ভাবেই এরা তালিবানি আধিপত্যবাদের তীব্র বিরোধী এই তাজিক জনগোষ্ঠীর নেতা আহমেদ শা মাসুদ 'নর্দান অ্যালায়েন্সের' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে তালিবান সংস্কৃতির বিরোধিতা করে আসছে। ১৯৯৬-২০০১-এর মধ্যে তালিবান পুরো আফগানিস্তানে শাসন প্রতিষ্ঠা করলেও মাসুদের নেতৃত্বে পঞ্জশির স্বাধীন তালিবান মুক্ত প্রদেশ হিসেবেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। তালিবান বিরোধিতার ঐতিহ্য এই ছোট্ট প্রদেশটি ধরে রেখেছে সাম্প্রতিককালেও। আহমেদ শা মাসুদকে আল-কায়দা হত্যা করেছে ২০০১ সালে, কিন্তু মাসুদের মৃত্যু পঞ্জশিরের তালিবান-বিরোধী মতাদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি বা তাকে দুর্বল করতে পারেনি। আহমেদ শা মাসুদের ছেলে আহমেদ মাসুদ বাবার লড়াকু মনভাবের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন। পশ্চিমি শিক্ষায় শিক্ষিত মাসুদ সাম্প্রতিককালেও তালিবান বিরোধী সংঘর্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পঞ্জশিরের আদর্শের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য।

আপাত দৃষ্টিতে একথা মনে হতেই পারে যে, তালিবানের সশস্ত্র সংগ্রামকে প্রতিহত করতে নর্দান অ্যালায়েন্সের সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করা কতটা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি আধিপত্যবাদকে অবদমিত করতে পারে আরেকটি সশস্ত্র সংগ্রামই। তালিবান ও নর্দান অ্যালায়েন্স দুপক্ষই সশস্ত্র সংগ্রাম করলেও তাদের লক্ষ ভিন্ন। তালিবান উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদে বিশ্বাসী স্বৈরাচারী ও জঙ্গি শক্তি যাদের মতাদর্শ একটি উন্নয়নশীল আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের পরিপন্থী আর অন্যদিকে নর্দান অ্যালায়েন্স গোষ্ঠী গণতন্ত্রকামী একটি শক্তি যাদের লক্ষ আধুনিক আফগানিস্তান গঠন করা। দুই পক্ষের নেতাদের পাশাপাশি রাখলেও বিষয়টা পরিষ্কার হয়। নর্দান অ্যালায়েন্সের আমরুল্লা সালেহ, আহমেদ শা মাসুদ, সালাউদ্দিন রব্বানি প্রমুখ বিভিন্ন সময়ে গণতান্ত্রিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে আফগান সরকারের উপরাষ্ট্রপতি-সহ বিভিন্ন দপ্তরে মন্ত্রী হয়ে আধুনিক রাষ্ট্রগঠনের চেষ্টা করেছেন। এদের মধ্যে অনেকেই বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিত হয়েছেন। অন্যদিকে তালিবান নেতা প্রয়াত মোল্লা মহম্মদ ওমর, হিবাতুল্লা আখুনজাদা, আব্দুল ঘনি বরাদর প্রমুখ মূলত অশিক্ষিত ও ধর্মীয় আধিপত্যবাদী শাসনব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে। তাই বাঁচার তাগিদে বহু আফগান নাগরিক নর্দান অ্যালয়েন্সের ছাতার তলায় এলেও এখন পর্যন্ত তাদের প্রভাব খুবই ছোটো জায়গার মধ্যে সীমিত। মাসুদ, সালেহদের নর্দান অ্যালায়েন্সের তালিবানি-আদর্শ বিরোধী মতাদর্শ যতদিন না পঞ্জশিরের সীমানা ছাড়িয়ে বৃহত্তর আফগান ভূখণ্ডে পরিব্যাপ্ত হয়, ততদিন আফগানিস্তানে আধিপত্যবাদ খর্ব হবে না।

শোক সংবাদ

মালদা নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা মালদা নগরের পূর্বতন সঙ্ঘচালক সুধাংশুজ্যোতি রায়(মানিকদা) গত ২০ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও দুই পুত্র রেখে গেছেন। জেলায় সংস্কার ভারতীর সূচনালগ্ন থেকেই তিনি সংগঠনের প্রচার ও প্রসারে অনবদ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে স্বদেশি সময়ের গানগুলো জীবন্ত হয়ে উঠত। তিনি স্থানীয় অক্রুরমণি করোনেশন ইনস্টিটিউশনের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন।

***

মালদা জেলার গাজোলের স্বস্তিকা পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠক তথা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের গাজোল প্রখণ্ডের সভাপতি মন্মথ বিশ্বাস গত ১৯ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ২ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অনাদিনাথ কুণ্ডু গত ২৫ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। শ্রীকুণ্ডু গঙ্গাজলঘাঁটির লালপুর গ্রামের স্বয়ংসেবক হলেও কর্মসূত্রে বাঁকুড়া নগরেই থাকতেন। বাঁকুড়া নগর কার্যবাহের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহে প্রথম দলের নেতৃত্ব দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। প্রশাসনিক অকথ্য নির্যাতনের শিকার হন তিনি। পরে বিজেপির জেলা সংগঠন সম্পাদক ও জেলা সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

সুভাষ চন্দ্র বসুর দুর্গা আরাধনা

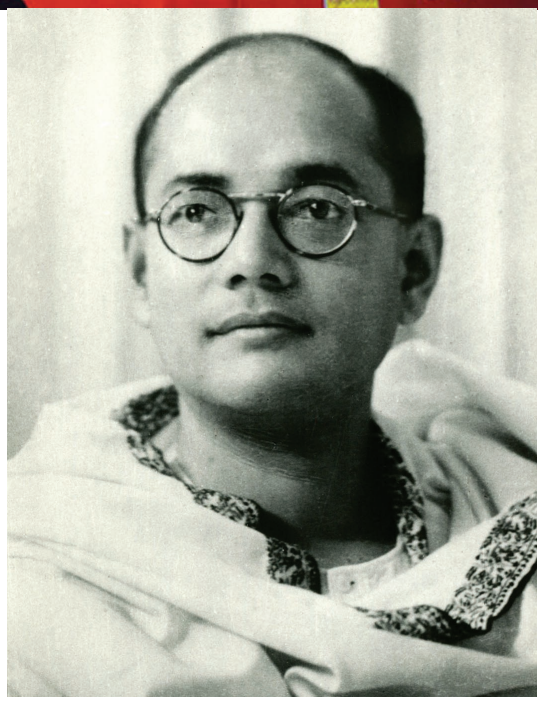

কৌশিক দাস

সাল ১৯২৬। ভারত তখনও স্বাধীন হয়নি, ব্রিটিশ সরকারের পরাধীনতার শিকলে বাঁধা ছিল ভারতবর্ষের গরিমা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। সেই সময় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রভাব তীব্র আকার ধারণ করেছিল সারাদেশে। প্রচুর বিপ্লবী যুবক অংশগ্রহণ করেছিলেন এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে। তাঁদের একটাই লক্ষ্য ছিল যেনতেন উপায়ে বিদেশি শক্তির হাত থেকে ভারতমাতাকে রক্ষা করা। তাতে যদি নিজের প্রাণও বলিদান দিতে হয় পিছপা হবেন না এবং তাঁরা করেও ছিলেন তাই। একজোট হয়ে সক্রিয় ভাবে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে।

বিভিন্ন গোপন আস্তানায় চলছে তখন তাঁদের ব্রিটিশ বিরোধী কাজকর্ম। ঠিক তখনই কলকাতাতেও বিপ্লবীদের জোটবদ্ধ করতে একটা কনভেনশনের দরকার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশদের চোখে ফাঁকি দিয়ে কলকাতাতে জমায়েত করা কার্যত অসম্ভব। তাই ফন্দি আঁটলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়ির কাছে সিমলা স্ট্রিটের মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ি। তিনি তাঁর বাড়িতে মাঝেমধ্যেই থাকতেন। সেই অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়ির মাঠেই দেবী দুর্গার শত্রু নিধনকারী রূপ মাথায় রেখে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বজনীন ভাবে মাতৃভূমি অর্থাৎ ভারতমাতাকে দুর্গা রূপে পুজো করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, দুর্গা মূলত শক্তিদেবী। দেবী দুর্গা নির্গুণ অবস্থায় এই জগৎ সংসারে বিরাজ করেন। তাঁর জন্ম হয় না, আবির্ভাব ঘটে। যাকে বলা হয় প্রাকট্য। দুর্গা সেই মহাশক্তি যে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, শিবের শিবত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব, প্রদান করেছেন। সেই দেবী-দেবতাদের সমষ্টিভূত তেজপুঞ্জ থেকে মহামায়ার সৃষ্টি হয় এবং মহিষাসুর নামক অত্যাচারী অসুরকে বধ করে তিন ধাম, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে শান্তি ফিরিয়ে আনেন এবং দশভুজা দুর্গা রূপে পূজিত হন এই ধরাধামে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ভারতমাতার

বন্দনায় ১৮৮২ সালে তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসে 'বন্দেমাতরম্' গান রচনা করেন। যেখানে ভারতমাতার রূপকে তিনি,

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী'।'

রূপে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্যাগের প্রতীক গেরুয়া বসনধারী দেবী চতুর্ভুজা লক্ষ্মী রূপে ভারতমাতার চিত্র অঙ্কন করেন। যাঁর চারহাতে রয়েছে, তাঁতবস্ত্র, অক্ষমালা, পুঁথি ও ধানের শিষ। তাঁতবস্ত্র যা ঐতিহ্যের বার্তা বহন করেন। অক্ষমালা সাধনার প্রতীক। পুঁথি যা অন্ধকার দূরীভূত করে জ্ঞানের চেতনা উন্মুক্ত করে এবং ধানের শিষ যা ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে দু-বেলা অন্নের জোগান দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসের 'বন্দেমাতরম্' গান যা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী শক্তির মূল মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। সকলের কণ্ঠে তখন একটাই ধ্বনি 'বন্দেমাতরম্'। আর সেই বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কণ্ঠে ধারণ করে বিপ্লবীরা এগিয়ে গিয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ভারতমাতার চিত্রটি পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতীক হয়েছিল,। কারণ সুভাষ যাঁর আদর্শকে স্বশরীরে বহন করে যাঁর দেখানো পথকে পাথেয় করে নিজেকে চালিত করেছেন এবং বাল্যকাল থেকে রাষ্ট্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, সেই মহান যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছর যেন আমাদের একমাত্র আরাধ্য দেবতা ভারতমাতা হন'। তাই তো ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সমগ্র ভারতবাসী দেবতাজ্ঞানে ভারতমাতাকে একমাত্র মাতৃদেবী রূপে পুজো করে ব্রিটিশ ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতার বিজয়পতাকা উত্তোলন করেছিলেন ভারতের মাটিতে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ চরকা চালিয়ে স্বাধীন হয়নি, এর জন্য কত সহস্র নারায়ণী সেনা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে কণ্ঠে ধারণ করে হাসি মুখে তাঁদের জীবন আহুতি দিয়েছেন মাতৃভূমির পরাধীনতা মোচনে।

বন্দেমাতরমের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় ভীত হয়ে একবার ব্রিটিশ সরকার জনসমক্ষে এই ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করে দেয়। এই সময় বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়ার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতমাতাকে দুর্গারূপে পুজো করার সমস্ত দায়িত্ব তুলে দেন বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর ওপর। নেতাজীর নির্দেশে পুজোর আয়োজনে ঝাঁপিয়ে পড়েন অতীন্দ্রনাথ বসু। বাড়ি বাড়ি ঘুরে আদায় করা হয় চাঁদা। তখনকার দিনে চাঁদা আদায় করে পুজো করার ব্যাপারটাতে একটা নতুনত্ব ছিল। কারণ তখনকার দিনে জমিদার বাড়ির পুজো ও বারোয়ারী পুজোর প্রথা ছিল। যেখানে সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রায় নিষিদ্ধ ছিল।

বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর হাত ধরেই প্রথম কলকাতার সিমলাতে সর্বজনীন দুর্গাপূজার সূচনা হয়। অতীন্দ্রনাথ বসুর সিমলার বাড়িতে বিপ্লবীদের জন্য শরীর চর্চায় সমস্ত রকম কলাকৌশল অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। যা পরবর্তীকালে সিমলা ব্যায়াম সমিতি নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এভাবেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জমায়েতও সহজভাবে হয়ে উঠেছিল। দেশমাতৃকার জন্য মাতৃ আরাধনা করাও সম্ভব হয়েছিল। ইংরেজ সরকার যখন বুঝতে পারল তাঁদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা ঘোর ষড়যন্ত্র করছে, সেই দিন থেকে বিপ্লবীদের আখড়া হিসেবে ইংরেজ শাসকরা সিমলা ব্যায়াম সমিতির ওপর নজর রাখতে শুরু করে। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে কলকাতার সিমলার ব্যায়াম সমিতিতে সর্বপ্রথম দুর্গা পুজো সর্বজনীন ভাবে পালিত হয়। তাই ব্রিটিশ সরকার এই পুজোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। দু'বছর পরে তা উঠে যায়। এভাবেই কলকাতার বুকে সর্বজনীন দুর্গাপূজার সূচনা করেন সুভাষচন্দ্র বসু। কিন্তু আজ দেখতে গেলে, যিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে জাতিভেদ প্রথার ঊর্ধ্বে উঠে সকলের জন্য দুর্গাপূজোর শুভারম্ভ করলেন ভারতমাতাকে বিদেশি শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য হারিয়ে গেলেন। তাই দেবী দুর্গার কাছে একটাই প্রার্থনা— 'দশভুজা তুমি ভারতজননী ত্রিশূল ধরো আবার'। যাতে নিজের সন্তানের ওপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে দশহাতে ত্রিশূল নিয়ে নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করে ভারতবাসীর জনসমক্ষে দেখিয়ে দাও তোমার অপার শক্তি। যাতে আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি,

'পূর্ব গগনে অরুণ-দীপ্তি, ফুটিছে নতুন ভোর।
ঐক্যবদ্ধ হিন্দু বিশ্বে, কেটে যাবে ঘন ঘোর।
এ ভারত হবে বিশ্ব জননী প্রত্যয় সবাকার, অন্তরে অনিবার'।

MUTUAL FUNDS Sahi Hai.

হ্যাঁ! আমরাই আপনাকে দিতে পারি
এক উন্নতমানের পরিষেবা
কারণ
আমাদের কাছ থেকে আপনি পাবেন

OUR PRODUCTS	OUR PLANNING
❖ Portfolio Management Services	❖ Retirement Planning
❖ Mutual Fund	❖ Pension Fund
❖ Life Insurance	❖ Children Education Fund
❖ General Insurance	❖ Daughter Marriage Fund
❖ Mediclaim	❖ Estate Creation
❖ Accidental Insurance	❖ Wealth Creation
❖ Company Bond & Fixed Deposit	❖ Tax Planning

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

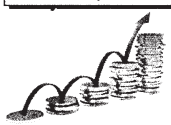

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা
১৯৯৬ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত
SIP তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন
তাদের প্রত্যেকের ফাণ্ড ভ্যালু বর্তমানে ১ কোটি টাকা
২০ বছরে মোট বিনিয়োগ ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মাত্র

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

মিউচুয়াল ফাণ্ডে বিনিয়োগে বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।